প্রেমের দর্শন

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী

ভ্রমণে দর্শন

ভ্রমণে দর্শন

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী
("সেবক")

প্রাপ্তিস্থান ঃ
রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া
কলিকাতা-৩৭

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৫৭

পুনর্মুদ্রণ—আশ্বিন ১৩৫৮

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭

হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫·২—১৮. ৯. ৫১

ভূমিকা

লেখক শ্রী"সেবকে"র সহিত আমার সম্প্রতি পরিচয় হইয়াছে। তাঁহার রচনা শক্তিতে আমি তাঁহার প্রতি তত আকৃষ্ট হই নাই, যত তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা এবং অদম্য প্রাণশক্তি আমাকে মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়াছে। যে নিদারুণ দুঃখদৈন্যের মধ্যে জীবন আরম্ভ করিয়া আঘাতের পর আঘাত এবং বাধার পর বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যে কোনও সাধারণ মানুষকে তাহা নিঃশেষে ধ্বংস করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াও তাহা তাঁহার কর্মশক্তি ও মুখের হাসি স্তব্ধ করিয়া দিতে পারে নাই। যে মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, 'ভ্রমণে দর্শনে' সেই মন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছি বলিয়া ইহা প্রচার করিবার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিয়াছি। ভ্রমণ অত্যন্ত মামুলি ও সাধারণ, কিন্তু লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অসাধারণ; তিনি অল্পের মধ্যে ভূমার সন্ধান পাইয়াছেন, সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার। তাঁহার দর্শন পাঠকের চিত্তে সংক্রামিত হইলে তিনিও বিশ্বাসী ও আত্মস্থ হইতে পারিবেন। এই রচনার মধ্যে আশ্বাস আছে, আশা আছে; সুতরাং ইহা জনসমাজের কল্যাণকর হইবে, ইহাই আমার ভরসা।

১ মাঘ ১৩৫৭ **শ্রীসজনীকান্ত দাস**

দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজন

বিশেষ আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, লেখক অজ্ঞাতনামা "সেবক"রূপেই অত্যল্পকাল মধ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন ও সহৃদয় পাঠক তাঁহার গুণগ্রাহী হইয়াছেন। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া তাহাই প্রমাণ করিতেছে। তিনি এবার স্বনামে অবতীর্ণ; আশা করি, এই নামকে তিনি উত্তরোত্তর জয়যুক্ত করিবেন এবং এই নামেই তিনি উত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

৫ আশ্বিন ১৩৫৮ শ্রীসজনীকান্ত দাস

উৎসর্গপত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে যিনি উৎসাহ, আনন্দ এবং প্রেরণা
দিয়েছেন এবং পরবর্তী জীবনেও যিনি আমার দুরন্ত
দারিদ্র্যের মধ্যেও অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছেন,
সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ
ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
মহোদয়ের পবিত্র
করকমলে উৎসর্গ ক'রে ধন্য হলাম।

গ্রন্থকারের নিবেদন

আমার পরম সৌভাগ্য যে, বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক এবং কৃতী সমালোচক 'ভ্রমণে দর্শন' সাদরে গ্রহণ করেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল তা বাংলা সাহিত্যের সংস্কৃষ্টির ফল।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হওয়ার পর যাঁরা প্রশংসাবাণী দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন তাঁদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ রইলাম। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুশীলকুমার দে, ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বাগচী ও সার্ জে. সি. ঘোষ প্রভৃতির প্রশংসা-পত্রগুলি এই গ্রন্থের অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল।

৭ই আশ্বিন ১৩৫৮ — শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী

কয়েকটি অভিমত

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—"...গ্রন্থে আপনার চিন্তাশীলতা, দৃঢ় বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও অকুতোভয় সত্যভাষণের প্রশংসনীয় পরিচয় আছে।...একটি উপভোগ্য মননশীলতার ছাপ বইখানিকে চিন্তাশীল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় করেছে।"

ডক্টর সুশীলকুমার দে—"...যে ভয়াবহ অর্থে দর্শন শব্দটি ব্যবহৃত হয় তাহার কথা বলিতেছি না; জীবন-দর্শনের সরস অভিব্যক্তি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অন্তরালে রহিয়াছে।"

ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—"'ভ্রমণে দর্শন' পড়িয়া আনন্দিত হইলাম।...বর্ণনার সরসতায়, অনুভূতির পুঙ্খানুপুঙ্খতায়, তীক্ষ্ণ মতব্যাখ্যানে, সর্ব্বোপরি ব্যক্তিত্বের অকুণ্ঠ প্রকাশে এই গ্রন্থখানি অনন্যত্ব লাভ করিয়াছে।"

অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বাগচী—"...আন্তরিকতার সহজ সুর ও পৌরুষের দ্বিধাহীন দৃপ্ত কণ্ঠ—আধুনিক বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে এ উভয়েরই অভাব আছে মনে হয়। 'ভ্রমণে দর্শন' এই অভাব খানিকটা মোচন করিয়াছে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা—"...বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির যখন নিবিড় যোগাযোগ হয়, তখন মনের কোণে আলাপ চলে। লেখক সেই আলাপই ভাষায় গাঁথিয়াছেন। এই আলাপ প্রাণের স্পর্শে পূর্ণ, তাই মধুর। ভাষাও প্রাণবন্ত, তাই আবেদন আছে।"

যুগান্তর—"...আলোচ্য বইখানি গতানুগতিক ধারা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতির—...সুন্দর ভাষা, সুচারু কারুকর্ম্মের গুণে বইখানি সত্যই উপভোগ্য।"

দেশ—"...লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি স্বল্পের মধ্যে ভূমাকে উপলব্ধি করিয়াছেন।"

Amrita Bazar Patrika—"...The book is a treasure in itself...Srisevaka speaks more than what is expressed in the pages of books. Let us pay homage to what he has seen and heard what we do not see and hear."

Sir J. C. Ghosh—"...I hope, the book will have many readers who will gain much by sharing your outlook and your views."

ভ্রমণে দর্শন

মানুষ মাঝে মাঝে বাইরে যেতে চায়। কেন যেতে চায়? ঘরের ভেতরে তার যা দেখা, সে দেখাতে অদেখার সন্ধান মেলে না। ঘরের বাইরে গিয়ে যা পাওয়া যায় সে পাওয়া যে কত বড় পাওয়া

"ভাষার অতীত তীরে,
কাঙাল নয়ন সেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।"

কত কাল চ'লে যায়! বাইরের আলো-হাওয়ার ভুল-করা তুচ্ছ দিনগুলি কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ড্যাফোডিল্‌সের মত যেন ভেসে আসে জীবন-ঘরে অন্তরের নয়ন-পথে। চমকে যায় দেহ মন, পুলকে ভ'রে ওঠে জীবন-ফুল। কোথায় সেই ১৯৪২ সনের মে মাস, ১৬ই তারিখ শনিবার আর কোথায় ১৯৪৯ সনের নভেম্বর মাস! কালকে জয় ক'রে আছে মন, অকালে আবার যেন ফিরে পাচ্ছি সেই হারানো দিন, হারানো পথ—আর সেই আত্মভোলা উদয়-শিখরের অসীম সৌন্দর্য। দার্জিলিং! তুমি তো বহুদূরে! কেটে গেছে কত দিন, কতটি বছর! তোমার মায়া তো কাটাতে পারি নি! তোমাকে আপন ক'রে পেয়েছিলাম, তাই আজ জীবনের পাতায় পাতায় যখন আমাদের সব সাধনা ও তপস্যা জীবন-সংগ্রামের ঘাতে প্রতিঘাতে বল্‌গাহীন অশ্বের মত ছুটে ছুটে অক্ষর-দেবতাকে হারাতে বসেছে, তখনই তুমি অক্ষরে অক্ষরে দেখা দিলে। 'সুন্দরের উপহার চির আনন্দের' (a thing of beauty is a joy for ever), তুমি সত্যময় ও আনন্দময় ব'লেই জীবন-দেবতা এতদিনের বিচ্ছেদের অন্তরে তোমার অরূপের রূপকে

রূপায়িত করেছে, এবং রূপকে সত্যে, সৌন্দর্যে ও সাধনায় জীবন্ত ক'রে সৃষ্টি ও স্রষ্টার অপূর্ব মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে—

"যাবার বেলায় এই কথাটি ব'লে যেন যাই,
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।"

পাহাড়ের দেশে এঞ্জিন সোজাভাবে চলে না, বাঁকাপথে ঘুরে ঘুরে গেলেই বিপদ বড় থাকে না, আর সমতল দেশে তা চলে সোজা এবং বেগ তার বেশি। ঘুরে ঘুরে চলাটাই তার স্বভাব। একই নিয়ম মেনে একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বিপরীতভাবে চলে। মনও মাঝে মাঝে একই নিয়মে কাজ করে না। কৃপণের ধনের মত পুঁথিগত বিদ্যা আঁকড়ে না ধ'রে সাদা মন বাঁকাপথে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে চায়।

সুযোগ এল শনিবার। তখন মে মাস। গ্রীষ্ম ও বর্ষার বিরহ-মিলনে চারিদিকে চঞ্চল জীবনের সাড়া পাওয়া গেল। ভোরবেলায় এল বাইরের ডাক। জলপাইগুড়ির খোলামাঠ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্রোজ্জ্বল শিখর মাঝে মাঝে দেহ-মন-প্রাণ কেড়ে নিয়ে যেত। ১৯৪২ সনের ১৬ই মে আমার পক্ষে স্মরণীয় দিন। তখন জলপাইগুড়িতে আমার সস্ত্রীক জীবনের প্রথম পারিবারিক পরিচয়। অর্থের প্রাচুর্য নেই, সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা নেই, তার ওপর সংসারের বোঝার চাপ আমাকে বইতে হচ্ছে ছাত্রজীবন থেকেই। সুযোগ সহজে আসে না, দুর্ভোগই ঘটে পদে পদে। অর্থহীনের জীবন চিরকালই অর্থহীন। এমন শুভদিনটিকেই জীবনের শুভমুহূর্ত ব'লে মনে করলাম। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা যতই থাকুক না কেন, এবার দৃষ্টকেই গ্রহণ ক'রে চলব অদৃষ্টের সন্ধানে। সম্মুখে প'ড়ে থাকবে শুধু এক বিন্দু নয়নের জল। পশ্চাতে প'ড়ে থাকবে হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের বেদনাপূর্ণ কাহিনী। এত বড় মনটাকে সংকীর্ণ ক'রে ফেললে দাম্ভিক সমাজ—শুধু ভান আছে, মান

নেই ; হৃদয় আছে, কিন্তু হৃদ্যতার জ্বলন্ত অভাব গভীর ভাবকে আহত ও পীড়িত করছে।

জলপাইগুড়ি স্টেশনে সাড়ে দশটা এগারোটার সময় নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের অপেক্ষায় রইলুম। গাড়ির বিলম্ব দেখে এবং বাড়ির সম্বল বাড়িতে রেখে মনে মনে কত দিনের কত জমাট ব্যথার ইতিহাস স্মরণ করলাম—জীবনের অমূল্য সময়ের দিকে আমাদের লক্ষ্য নেই, অথচ সথ্য পাতাবার শক্তি সংহত ও সংক্ষিপ্ত হয়ে আছে। রেলওয়ের সময়টাতে জীবনযাত্রার অনেক সময় কাঁটায় কাঁটায় দাগ দেওয়া থাকে—লম্বা ছুটিতে খোলার তারিখে চাকরিতে যোগ দেবার জন্যে কেউ হয়তো ট্রেন ধ'রে চলেছেন। ১২টার পূর্বে ট্রেন নিশ্চয়ই থামবে। ১০-৩০ মিনিট নির্দিষ্ট সময়—ট্রেন পৌছয় নি। যে জনসাধারণের সেবক, তার ভুলভ্রান্তিতে কত লোকের সর্বনাশ ঘটে। মানুষ চলন্ত জীব—বাঁধাবাঁধি নিয়মে থাকলে অনেক সময় তার বিপদ কমে এবং বাড়ে ; সময়, স্থান ও সীমা বুঝে অনেক কৈফিয়ৎ চলে। ট্রেন নিয়মকে মেনে নিয়েছে, নিয়মের বাইরে গেলে বিপদ হয় অন্যের। নিয়মের পথে অনিয়ম হ'লে বিভ্রাট ঘটে অনেক। বারোটা বেজে গেল। অস্থির হয়ে পড়লাম, মুখে আর মনে ট্যাক্স রইল না। সময়কে খাটিয়ে যারা চলে, অসময়ের বিলম্বটা তাদের পীড়িত করে খুব বেশি। আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। বড় বড় নেতা অর্থহীন হয়ে পড়েন। সময়ের অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার এত ব্যাপক যে, অনেক ক্ষেত্রে ঘৃণায় ও লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হয়। বেলা তখন সাড়ে বারোটা। ট্রেন এল না যে! স্টেশনের এক ধার থেকে আর এক ধার পর্যন্ত বেড়াতে বেড়াতে ভাবতে লাগলাম—আমাদের জাতীয় দুর্বলতার দুটো গলদ বড়ভাবে দেখা দিল। এ দেশে পথের ও মায়ের পূজা নেই। যে পথের উপর দিয়ে হাজার

গাড়ি ঘোড়া ও যাত্রী চলে এবং যে মায়ের চালনায় হাজার হাজার শিশু গ'ড়ে ওঠে, সেই দিকে জাতির কোন দৃষ্টি নেই। পথগুলি হয়ে যায় সরু, ভগ্ন, রুক্ষ ও বিকৃত। সপ্তাহে সপ্তাহে দুর্ঘটনা হয়, বৃষ্টিতে গাড়ির চাকা যখন ব'সে যায়, কত মূল্যবান জীবন কাদায় মাটিতে জলে গড়াগড়ি যায়। জনসাধারণের ও কর্তৃপক্ষের এই সব প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য নেই। "আমার জীবনটা বেঁচে থাকলেই হ'ল—রাম-রহিমের জন্যে ভেবে কি হবে?" শুধু পথ-ঘাটেই নয়—পরের জন্যে আমাদের আত্মাদর নেই ব'লেই যেখানে বসতি হবে, সেখানে হচ্ছে জঙ্গল ; যেখানে থাকবে মানুষ, সেখানে থাকছে বনমানুষ ; যেখানে গড়বে রাজ্য-বাণিজ্য, সেখানে গড়ছে শবের রাজ্য ; কারণ চালক ও চালিত দুইই শেষকালে অচল হয়ে পড়ে এবং বিকল থেকে সচলকে বিকৃত করে। ট্রেন তো আর দেখা যায় না।

অভিমন্যুর চক্রব্যূহ ভেদ ক'রে প্রবেশ করবার কৌশল জন্ম থেকেই জানা ছিল, কিন্তু বের হবার নীতিটা একেবারেই জানা ছিল না—দার্জিলিঙের অনন্ত রহস্য-ঘেরা বিচিত্র প্রকৃতির চক্রব্যূহে প্রবেশের কোন অধিকার ছিল না। ট্রেন বিলম্বে এল, তাতে আমার সব ঠিক হয়ে গেল। একাই তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় স্থান ক'রে নিলাম। বন্ধু নেই, সাথী নেই,—শুধু একা, শুধু একা। ছেলেবেলার স্বপ্ন এতদিন সার্থক হবে, এ আশাই বুকে বাসা বেঁধে রইল। দীর্ঘ ভ্রমণে একার বিপদ ঘটে অনেক, কিন্তু কয়েক দিনের নির্দিষ্ট ভ্রমণে একার তো বালাই নেই। অপরিচিত জায়গায় একা ভ্রমণেই সুবিধা ঘটে অনেক। দরকার হ'লে না খেয়ে থাকা যায়, যেখানে সেখানে জায়গা ক'রে নেওয়া যায়—কত দিনের কত কথা, কত সুখ-দুঃখের ইতিহাস একা ভ্রমণের পথে ভেসে আসে। মনটা বেশ খোলা থাকে—প্রাণটা যেন ভোলানাথের মত

আনন্দে ভোলা থাকে। আকাশের কালো-মেঘের আবছা দৃষ্টির মধ্যে আমি একাই যেন অনেককে পেলাম, দেহ ছেড়ে মন ভেসে ভেসে চ'লে বেড়াচ্ছে। এমন সময় তন্দ্রাপীড়িত অলসভাবের মধ্যে প্রায় ২-১৫ মিনিটে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়িতে এল। এখানে এসে একটু পাহাড়িয়া ছাঁচের পরশ পেলাম। চ্যাপটা নাক ও বেঁটে দেহের অনেক জীবন্ত ছবি সামনে পেছনে দেখা গেল। ভাষার লড়াই চলেছে সমানে। কেউ হিন্দীর শ্রাদ্ধ ক'রে যাচ্ছে, কেউ কেউ আবার বাংলা-ইংরেজীর খিচুড়ি ভাষায় চমৎকার বাগ্‌বিতণ্ডা ক'রে যাচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে দু-এক জন দোকানদার আহ্বান ক'রে বলছে—আস্থন স্তর—উয়ান কাপ টি স্তর—ইট ড্রিঙ্ক স্তর—ভেরী রিফ্রেস করে স্তর। বেশীর ভাগ পাহাড়িয়াই হিন্দী-উর্দুর গোলামি ক'রে বাংলাকে জবাই দেবার চেষ্টা করছে। জীবনের নানা দিকের নানা ভাব, নানা ভাষা, নানা আচার-ব্যবহার একসঙ্গে মিলে যে ভ্যারাইটি পার্‌ফর্‌মেন্স করে, তা ভ্রমণের সময় যেমন উপভোগ্য তেমনই উপাদেয়। যাতায়াতের পথে শুধু প্রিয়কে নিয়েই চলা যায় না, অপ্রিয়কেও নিতে হয়, স্থখ-দুঃখকে যেমন সহজভাবে গ্রহণ ক'রে যেতে হয়,—শীত-গ্রীষ্মকেও সঙ্গী ক'রে চলার পথে সংগীতের মত সাধতে হয়। দেহের যত সৌন্দর্যই থাকুক, মনের ঔদার্য না থাকলে দেশ-ভ্রমণ হয় না এবং কোন আনন্দ মেলে না। মনের দারিদ্র্যে মানুষ কেবল যে মরে তা নয়, সবার চোখে সে নিজেকে অবজ্ঞার যোগ্য ক'রে তোলে—আর দেশকে ও সমাজকেও পরের কাছে খাটো ক'রে রাখে। চলার পথে এমন সব ঘটনা ঘটে বা এমন সব অন্তরের কথাবার্তা হয়, যা ছাপার অক্ষরের মধ্যে কোথাও মেলে না। মূর্খও অনেক সময় চরিত্রের মাধুর্যে এবং হৃদয়ের গভীরতায় জ্ঞানীকে মূক ক'রে দেয়,

এখানে দরিদ্রও তার প্রাণের ভালবাসায় এবং লোভহীন আন্তরিকতায় ধনীর অহংকার চুরমার ক'রে দেয় আর প্রাচুর্যের আড়ম্বরকে লজ্জিত ক'রে দারিদ্র্যের গৌরবকে বাড়িয়ে দেয়। তখন মনে হয়—

"দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন।"

শিলিগুড়ি থেকে

২-৩০ মিনিটের সময় দার্জিলিঙের ট্রেন শিলিগুড়ি থেকে ছাড়ল। এতদিনের একঘেয়ে অবস্থায় ঘরে ব'সে থাকার জড় অভ্যাসটুকু যে আজ ঘুচে গেল. তাতেই মনকে আর ধ'রে রাখতে পারি নি। পুরাতন সমতলকে ছেড়ে আজ ট্রেন যেমন আস্তে আস্তে উপরের দিকে ঘুরে ঘুরে চলছে, মনের উচ্চতাও আপাতত বেড়ে যাচ্ছে। তখন মনে হ'ল,

"O Solitude ! there are the charms
That a traveller hath seen in thy face."

নগরের কৃত্রিম গন্ধ নেই, গ্রামের জড় জীর্ণ ভাব নেই, আর সিনেমার বা খেলার মাঠের লাইন-ধরা টিকেট-কাটার ডাকহাঁক নেই। মনে হ'ল, নগরের মানুষের সুযোগ বড় হতে পারে, কিন্তু অন্তরের বা হৃদয়ের সম্বন্ধ হয় একেবারেই ছোট। সে বৃহৎ জগতে মানুষ বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষিপ্ত, চারদিকের ভাঙাগড়া এবং প্রকৃতির বন্ধুর মন্থণ বিচিত্র প্রকাশ দেখে মনও নূতনকে পাবার জন্যে এবং জানবার জন্যে নীরবে প্রস্তুত হয়। সমতল ভূমির মত ট্রেন জোরে চলে না, গতিবেগটি

সংযত ক'রে ট্রেন তার পথ ঠিক ক'রে নেয়। আমাদের কামরায় প্রত্যেক বেঞ্চিতে দুজনের স্থান। আটটি ছেলে টিকিট না ক'রে ঢুকে গেল—ওরা সব থোড়াই কেয়ার করে। "সময় তো আছে, টিকিট ক'রে নিন, এমন ভাবে ফাঁকি দেবেন?"—বলতেই ছোকরার দল "থামুন, থামুন, নীতি শেখাবার স্থান এ নয়—'উই নো হাউ টু লিভ অ্যাট দি কস্ট অব আদার্স'" (we know how to live at the cost of others)। প্রতিবাদ না ক'রে চিরসাথী সেই পথের দাবিটি নীরবে অন্তরস্থ করতে আরম্ভ করলাম। এ সব ছোকরাদের অর্থহীন দাবিই দেশকে দাবিয়ে রাখবে।

আটটি ছেলেই আমার নীরব প্রতিবাদ সহ্য করতে না পেরে অন্য দিকে স্থান ক'রে নিলে। তখনই "এবার ফিরাও মোরে" কবিতার একটি ছবি জ্বলন্তভাবে চোখের সামনে ফুটে উঠল—

"সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক..."

দাসত্বের মধ্যেও স্বাধীন মনটা তো ঠিক ভাবেই চলাফেরা করে। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না—ঠিক সময়ে তা খচ্‌খচ্‌ ক'রে কলিজায় বেঁধে! চরিত্রের যে গুণ থাকলে সমবেত হওয়া সহজ হয়, মিলনের আনন্দ ঘটে, সেই সব যে আমরা আগেই বিক্রি ক'রে যাই, অথচ পথের ধূলোতে অবজ্ঞায় ফেলে আসি। আস্তে আস্তে সমতল সবুজ চোখের আড়ালে যেতে লাগল। ট্রেন পাঞ্চনই জংশনে থামল। স্টেশনের চারদিক দেখে পাহাড়ের দেশের সামান্য পরিচয় পেলাম। ঢালু ভূমিতে মাঝে মাঝে চা-গাছের সরু সরু সারি, কোন কোন জায়গায় আবার বাঁকা-গাছের সারি, স্টেশনের বাম দিকে

শাল ও শিশু গাছের সরল শ্রেণীবদ্ধ লাইন-করা জুড়ি চোখের সামনে একটা বিরাট নূতনের পরশ জাগিয়ে দিল। পাহাড়ের দৃশ্য আরম্ভই হয় নি, তাতেই এতদিনের ভাঙা হৃদয়ে জেগে রইল—মাই হার্ট লীপ্‌স আপ হোয়েন আই বিহোল্ড এ রেন্‌বো ইন্‌ দি স্কাই—

হৃদয় আমার নাচে
রামধনুর দেখা পেয়ে

দৈনন্দিন জীবনের কর্মক্লান্ত জগৎ প'ড়ে রইল পেছনে আর সামনে ফুটে উঠল অনাগত আনন্দের রহস্যঘেরা প্রকৃতির সীমাহীন আনন্দের ছবি! প্রশ্ন হ'ল অনন্তের পথে—

"তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা!
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা ক'রে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও!
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?"

এ সব ছবি ছবিই নয়। শিল্পী তাঁর শিল্পের কারুকার্য নিয়ে উপরে ব'সে আছেন, অন্তর দেখে নিচ্ছেন, আর বাইরে তার চাতুর্য দেখিয়ে অ-রসিককেও রসিক করছেন।

স্থকনা থেকে

স্থকনা স্টেশনটি প্রায় ৫৩৩ ফুট ওপরে আছে সমতল থেকে। আবেষ্টনী বেশ অকৃত্রিম, প্রকৃতির দৃশ্য যেন সজীব ও সচল—প্রকৃতির ও মানবের কাজের অপূর্ব সামঞ্জস্য রয়েছে এখানে। দশ মিনিটের বিশ্রামের অন্তরে অনুভব করলাম, আমাদের জীবনের রহস্য প্রকাশিত কোথায়! ধ্বনি-প্রতিধ্বনির তাৎপর্য কার ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে! গভীর নীরব সমাধির গাম্ভীর্যের আরম্ভ এই জায়গা থেকে। সসীমের সঙ্গে অসীমের সংযোগ অনুভব ক'রে প্রকৃতি ও মানুষ যেন একই সুরে বিচিত্র সংগীত রচনা করতে লাগল। সংগীতের মাধুর্য নীরবতার বেদীমূলে সঞ্চিত রয়েছে। আমাদের প্রাণে বেদনা জাগ্রত হয়ে সাধনার সূচনা দিয়ে যাচ্ছে। নীরব আনন্দে প্রণত হলাম। একবার কামরার ভেতর থেকে উর্ধ্বে তাকালাম আবার নিম্নে অতল-গভীর তলের দিকে তাকালাম, চক্রের মত ঘুরে ঘুরে সাপের মত তির্যকভাবে বাঁকাপথ ধ'রে চলছে গাড়ি। ওপরের দিকে এঞ্জিন তার ওজন ও সামা রেখে চলছে খুব জোরে নয়, খুব ধীরেও নয়। যে মুহূর্তে এই চলবার জীবটি ওজন হারাবে, সেখানেই হবে বিরোধ, বিদ্রোহ ও সংগ্রাম। ওপর থেকে নীচে, নীচ থেকে ওপরে কত কৃত্রিম ও অকৃত্রিম সৌন্দর্য দেখা দিতে লাগল—সব ধরা দিল না, ধরতেও চাই নি; এইটুকু জানি, যত ধরা না যায়, যত ছোঁয়া না যায়, ততই তারা আপন হয়ে দেখা দেয়, ধরা দেয় ও মিলে যায়।—

"নয়নের মাঝে নিয়েছ যে ঠাঁই;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।

আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।"

শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে

তারপর সেই শিলিগুড়ি স্টেশন। এখান থেকে পাহাড়ের শোভা আরম্ভ হ'ল। বৃক্ষের শ্রেণীবদ্ধ সৌন্দর্য, লতাপাতার মনোহারিত্ব এবং পাথরের বিচিত্র রূপ মনের মধ্যে প্রথম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিচয় দেয়। ডাইনে বাঁয়ে উপরে নীচে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফাঁকা ফাঁকা সব কুটীর। দেখতে যত ছোট মনে হয়, তার চেয়ে অনেক বড়ো। এখানে পাথরের পাহাড়ে এবং সরল গাছের লতায় পাতায় অসংলগ্নতা আছে। সৌন্দর্যের মোহ নেই, কিন্তু মনোহারিত্ব আছে। এখানে উত্থান-পতনের যে নিয়ম ও অনিয়ম আছে, তাতে বন্ধনের একটা নিয়ম রয়েছে। বোঝা যায়, এর নিজস্ব নিয়ম না মেনে চললে নিজস্ব সম্পদ মেলে না, গরমিল নিয়ে কোন সমাজ বেশি দিন টে কে না। সৌন্দর্যের নিয়মকে মেনেই মানুষ পরিপূর্ণ হয়ে বাঁচবার অধিকার লাভ করে। সৌন্দর্য ক্ষুধাতৃষ্ণার টানে কাজ করে না। প্রাণযাত্রার গরজে যদি ক্ষুধাতৃষ্ণা জ্বলে, সৌন্দর্য তার ওপরে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদ রক্ষা ক'রে যায়। প্রকৃতির প্রাণপূর্ণ রাজ্যের বাইরের দিক থেকে দেখলাম, মানুষকে যখন বাঁচতে হবে, তখন ইহকালেই পূর্ণ হয়ে তাকে বাঁচতে হবে, পৌরুষে বীর্যবান হয়ে বাঁচবার জন্যে তাকে ঘুরে ঘুরে মনের চোখেও অনেক জিনিস দেখতে হবে। জানানো কথাকে জানানো যায়, কিন্তু হৃদয়ের গভীর কথাকে জানানো যায় না। প্রকৃতি ও মানুষের রহস্য বের ক'রে কে যেন অসীম আড়ালে সমাধিস্থ হয়ে আছেন।

শিলিগুড়ি স্টেশন থেকেই একটা দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে। সে পরিবর্তনে মিথ্যা, মেকী বা ফাঁকির কারবার থাকে না। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সত্য থেকে দূরে গিয়ে আমরা যে লেখাপড়া করি, তাতে গলদ থাকে অনেক। আমাদের সত্যিকারের প্রেম, বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা সমতল দেশ থেকে উর্ধ্বে গেলেই জন্মায়। ঐ সব বন্ধুর ও ভাঙা পাথর বা গাছের দেশকে চোখে না দেখলে কুকুর যেমন কাচের মন্দিরে আপন ছায়াটি দেখে কেবল চীৎকার ক'রে মরে এবং ভুল ক'রে কেবল ছুটোছুটি করে, আমাদের কাল্পনিকতার মিথ্যা লেখাপড়াও আমাদের চোখের রঙ মাত্র বদলে দেয়, মনের রঙ বদলায় না, মুখের রঙ পাউডার-স্নোর প্রলেপে রুচির বা চর্মের পরিবর্তন ঘটায়, কিন্তু হৃদয়কে মুগ্ধ করে না ; দেহের স্ফীততায় বা অক্ষীণতায় মুখের লাবণ্য ও মাধুর্য বিকৃত হয়ে পড়ে। একবার শিলিগুড়ির ক্ষীরের সিঙাড়া খেয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 'ইয়ারো আন-ভিজিটেডে'র (Yarrow unvisited) মাধুর্যরসের কথা মনে হ'ল। যাকে দেখি নি, সে না জানি কেমন ? যাকে দেখব, সে তো এখনও প্রকাশিত হয় নি ! যখন প্রকাশিত হবে, চোখের মনের সামনে বাহুতে বাহু মিলিয়ে পাব, চারিদিকে চলাফেরা ক'রে পাব, তখন তাকে কি ভাবে পাব ? দার্জিলিং না জানি কত মধুর ! শিলিগুড়ি থেকেই আমার মনে হ'ল, 'প্রেমের হীরক' পেয়েছি। মন নৃত্য করে কেন তার চিন্তায় ! প্রেমের রাগিণীতে প্রেমিককে না দেখেই ক্ষণে ক্ষণে বাজে। এই হীরকমণি তো এতদিন আমার কাছে হাল্কা ছিল, তাই পাল্লা ছিল অনেক উঁচুতে, এখন সে কল্পনার 'দার্জিলিং-হীরক' পরিপূর্ণ হয়েছে, কাজেই মাপবার প্রয়োজন নেই। সেই নয়ন-জুড়ানো স্বামী যেন আমাতে মিলে গিয়েছেন। ছাপা তিলক লাগিয়ে অহংকার-

স্ফীত হয় তারাই, যাদের সম্বল নেই, যাদের প্রাপ্য ধরা দেয় নি, আদায় করতে যারা জানে না। আজ কেবল ডাক পাচ্ছি বাহির-ভিতর থেকে—এস, আমার জগৎ থেকে দূরে কেন? বসন্তের ও গ্রীষ্মের পরিপূর্ণ খেলার মধ্যে সেই অসীম সুন্দরকে ছেড়ে আর থাকবে কেন? 'ধনধাম' ত্যাগ ক'রে একবার 'বনধামে' গিয়ে তাকে দেখে আয়, তাকে নিয়ে খেলা কর্, তার সঙ্গে মিলে যা। জল ছাড়া মাছ যেমন ছট্‌ফট করে, সেই দার্জিলিংকে দেখবার জন্যে মন তেমনই ছট্‌ফট করছে কেন? কারণ পবিত্র আকাঙ্ক্ষা আছে, প্রেরণা আছে, চাওয়ার ও পাওয়ার ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতা আছে। মনে হ'ল "ইয়ারো ভিজিটেড" কখন হবে! শিলিগুড়ি থেকেই মনে হ'ল, আর সবই কেনা যায়, বেচা যায়; কিন্তু পাহাড়ের দেশে যে সত্য মেলে, তা কেনা যায় না, তাকে অন্তর দিয়েই এবং হৃদয় দিয়ে পাওয়া যায়। অনন্ত আকাশতলে বিরল জনসমাগমের নিস্তব্ধ তরঙ্গের চারিধারে পাহাড়ের এবং পাহাড়-ঘেরা গাছ-লতা-পাতার যে আকার আছে, রূপ আছে, রেখা আছে, সে সব যেন রূপহীন, রেখাহীন ও আকারহীন হয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়।

প্রশ্ন হ'ল বিশ্বকবির ভাষায়—

"স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই,
তার ঠিক-ঠিকানা নাই।
তার আরম্ভ নাই নাই রে তাহার শেষ,
ওরে নাই রে তাহার দেশ,
ওরে নাই রে তাহার দিশা।
ওরে নাই রে দিবস, নাই রে তাহার নিশা।"

উত্তর এল কবীরের ভাষায়—

"জনম-মরণেতে অমীকী ধারা—
প্রেম-পিয়ালা লাও
সরস গগন যে হোতে মহাধূন
সাধন স্থন উঠি ধাও।"

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আনন্দের ও অমৃতের প্রবাহই চলে। যাঁর দ্বিতীয় নেই, যাঁর মঙ্গলধ্বনি নিয়ত প্রবাহিত, তাঁর প্রেমের পেয়ালা গ্রহণ ক'রে জীবন সার্থক কর। গগনে গগনে তাঁর মহাসংগীত ধ্বনিত হচ্ছে—অন্তরের সাধনায় হৃদয়ের উদারতায় ও দৃষ্টির মাধুর্যে সাধনা ক'রে কান পেতে শোন, নয়ন মেলে দেখ, এবং সুপ্ত দেবতাকে জাগ্রত কর। "উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

মনে মনে কত দিনের কত কালের কত কবির ও কত মহাজনের কত কথা জেগে উঠছে একটি সহজ মীমাংসা নিয়ে—

"তাই ফুটেছে ফুল,
বনের পাতায় ঝরনাধারায় তাই রে হুলস্থুল।
স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে,
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দকল্লোলে।"

রংটং স্টেশন

তখন বেলা চারটে। ঘুমের ঘোর যেমন আছে, শীতের আবেশও রয়েছে। হঠাৎ কে যেন ডেকে বললে—"সুখ-সাগরে এসে পিপাসার্ত হয়ে ফিরে যাবি কেন? এবার জেগে চোখ মেলে দেখ্। সামনে নীচের দিকে পাবি নির্মল সলিল, তারও নীচে পাবি মহাগভীর

গর্ত—কোথাও রৌদ্র, কোথাও মেঘ, ঘন ঘন বৃক্ষশ্রেণী”—“আপ আপন পৌ চীন্ হু”—আপনাকে আপনি চিনে নাও।

চোখ মেলে দেখি, আমি তো শিলিগুড়িতে আর নেই। রংটং স্টেশন (Rangtang Station)। যেমন নামটি, তেমন বিধাতার কাজটি। সব স্বপ্ন সত্য হচ্ছে। মানুষের কাজে এবং প্রকৃতির কাজে যখন বিরোধ না ঘটে, তখন নির্ভয়ে সকলেই চলাফেরা করে। এক দিকে মোটরের রাস্তা চলেছে। অন্য দিকে এঁকেবেঁকে চলেছে চলার পথ। ডান দিকে উঁচু উঁচু সব গাছ—কোথাও ফাঁক নেই, সামনে ও পিছনে অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়। হঠাৎ চোখ প'ড়ে গেল ঝরনার দিকে। এই পবিত্র ধারা এখানে এল কি ক'রে? তার উৎপত্তিস্থান কোথায়? সময় অত্যন্ত কম, বেলাও পড়ে পড়ে। দার্জিলিং গন্তব্য স্থান। কামরা ছেড়ে যাওয়ার পথ নেই। সেখান থেকেই পাহাড়ের রাস্তার বিশেষত্ব দেখা যায়। বরাবর কোথাও যাও না—সামনে খাদ পড়ে বা পাথর পড়ে। রংটং স্টেশনের বাঁ দিকে লাইন ঘুরে বরাকর যেতে হয়। সহজেই ঐ লাইন দিয়ে সেবক যাওয়া যায়। “সেবকে একদিন”। এখনও they flash upon the inward eye which is the blish of solitude। চার বন্ধু মিলে সেই একটা দিনকেই কতভাবে সফল ক'রে নিয়েছিলাম! মিস্টার জে. সি. বোসের মুচকি হাসির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মৌলভী রহিম ও জীলানি সাহেবের আন্তরিকতা, পাথরের ওপর ব'সে রুটি খাওয়া, জলহীন পাহাড়ের দু মাইল দূরের ঝরনার জল পাওয়া, চার জনের বেসুরো রাগিণীর ছন্দতালহীন গান, বনানীর নীরব জাগরণ—এখনও প্রাণের মধ্যে নূতন জাগরণ ও শিহরণ আনে। এখন স্তম্ভহীন চাঁদিমারেখার সেবক করোনেশন ব্রিজই বা কোথায়, দুজন অন্তরের মুসলমান বন্ধুই কোথায়, আর বোস্ বন্ধুই বা

কোথায়? জগতে সবই এইভাবে হঠাৎ মেলে আবার হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। থাকে শুধু ধ্বনি, স্মৃতি, ভাব ও বিশ্বাস। রংটং স্টেশনের চারিদিকে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তা শুধু মাটি-পাথরের মধ্যেও লাগানো নয়, কোথাও পাহাড় ফলহীন বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে আবার কোথাও সরু সরু ছোট ছোট ফলবান বৃক্ষের পুঞ্জে পুঞ্জে অপূর্ব সাজ-সজ্জায় ও রাগ-রাগিণীতে বিস্তৃত ও বিক্ষত। সামনে দেখা গেল, অনন্ত মেঘবিস্তৃত কালো কালো পাহাড়। প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদের মধ্যে "আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে তোমার মনের দিকে"! আমার সুখের পর্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে তোমার গানের পানে।

রংটং স্টেশন ছেড়ে পাহাড় বেয়ে ইঞ্জিন চলল গাড়ি নিয়ে "জেড" (Z)-এর রেখায় ঘুরে ঘুরে। সব দিকে ঘন ঘন কুয়াসার সন্নিবেশ, সূর্যের আলো বিকালবেলায় সে দেশে সহজে মেলে না। নীচে থেকে ২০০০ ফুট ওপরে উঠে বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে টের পেলাম, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। সূর্যের ম্লান কিরণ কখনও মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, কখনও পাহাড়ের মাথার ওপরে, কখনও বা গাছের আগায়, কখনও বা আকাশের নবনির্লিপ্ত কুয়াসার জালে মিলে আছে। সে সৌন্দর্য চোখে দেখা যায় না, মনেতে তার রূপ আঁকা যায়। আবার ভাবলে পরে তার রূপের ও ভাবের নাগাল পাওয়া যায় না, সেইটিও জীবনের শুভসম্পদ; কারণ ও তো মন থেকে তলিয়ে অন্য কোথাও যায় না। হৃদয়ের নিভৃততম গহ্বরে জীবনের সমস্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে চুপ ক'রে জেগে থাকে। গোধূলি-সন্ধ্যার মিলন-মুহূর্তে সেই হৃদয় শিশুর মত বারংবার অপ্রাপ্য পাবার জন্যে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে যায়। পাহাড়ের সব দিকেই যেন চিরসুন্দরের নবযৌবন পূর্ণ হয়ে রয়েছে। সেই দু হাজার ফুট ওপরে পতনের ধার বেয়ে বেয়ে আমাদের হচ্ছে উত্থান। উত্থানের

দিকে শুধু পাহাড় গাছ পাথর লতা, কিন্তু পতনের দিকে একেবারে গভীর খাদ, পড়লে আর ওঠবার জো নেই। তারপর এঞ্জিন গাড়ি নিয়ে চলল সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে। কে সন্ধান দিল সেই সুড়ঙ্গের পথের! মানুষই সেই অপরিচিত পথের সন্ধান পেয়ে গন্তব্যস্থানে পৌছবার জন্য সুড়ঙ্গ কাটে, বনজঙ্গল পরিষ্কার করে, বন্ধুরকে মসৃণ করে এবং মসৃণকে বন্ধুর করে। প্রয়োজনবোধে সে একবার যা ভাঙে আবার তাই গড়ে। প্রকৃতিকে কাজে লাগাবার জন্যেই মানুষ। প্রকৃতি তার সব সম্পদ মানুষকে দেবার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে, আর মানুষ তাকে ভুল ক'রে ভুল গ'ড়ে সহজকে কঠিন করছে, কঠিনকে আরও জটিলতর করছে—শান্তি মৈত্রী প্রীতির পরিবর্তে কেবল বিদ্রোহ বিপ্লব এবং ব্যভিচারই মানুষকে প্রকৃতির চোখে এত হীন নীচ ও সংকীর্ণ ক'রে রেখেছে। চিরকাল মানুষের সভ্যতায় মাৎস্যন্যায়ই দেখা গিয়েছে—বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে গিলে ফেলেই জীবন-সংগ্রাম করছে। কোন কোন যুগে বর্বরতা চরম সীমায় উঠেছে। কোন কোন যুগে বর্বরতা নীতির নামে, ধর্মের নামে, ন্যায়ের নামে শোষণ ও সংহার ক'রে কোন কোন জাতিকে নিশ্চিহ্ন করেছে, কোন কোন জাতিকে পঙ্গু অচল ক'রে পদানত রেখেছে, কোন কোন জাতি হয়তো স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে ক্রীতদাসত্বের ও গোলামির বীজ বুনে বুনে অবলম্বনহীন ও দেউলিয়া হয়ে নৃশংসতার চরম সীমায় যাচ্ছে। মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু, প্রকৃতি তো নয়। প্রকৃতি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে চারিদিকে তার আয়োজন ও অনুষ্ঠান বিস্তার ক'রে রেখেছে। আর মানুষ সেই সম্পদ লুণ্ঠন ক'রে দস্যু হচ্ছে, দানব হচ্ছে, পরের রক্ত চুষে নিজের রক্ত তাজা করছে। রক্তবীজের দল ও মহিষাসুরের দল পুষ্ট হয়ে মানুষ ও দেবতাকে প্রকৃতির কৃপাপাত্র ও করুণাপাত্র

করেছে। এই সব প্রকৃতির সহজ ও সুন্দর দৃশ্য নিজের চোখে দেখলে সমস্ত জটিল সমস্যা সহজে মিটে যায়। জীবনের সমস্ত অবসাদ ও দুর্বলতা ঘুচে যায়। সমাজের মানুষ যে কত কৃত্রিম, কত জঘন্য, কত কপট এবং কত প্রতিহিংসাপরায়ণ, তা সহজেই ধরা পড়ে। এক-একটা পাহাড়ের স্টেশন ও তার চার ধার দেখলে মনে হয়—

"যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন
যা পাই নি সে তো বড় নয়।"

আবার কবে ফিরে আসব? এই কি আমার প্রথম, এই কি আমার শেষ? যে যায়, সে কি আর ফিরে আসে?

চুনভাটি ও তিনধেরিয়া স্টেশন

চুনভাটি স্টেশন থেকে তিনধেরিয়ার দূরত্ব বেশি নয়। ২০।২৫ মিনিটের তফাত। প্রথমটি ২২০৮ ফুট ওপরে। এখানে উল্টো দিকে যেতে হয়, তারপর ফিরে এসে আর একটি পথ ধ'রে চলতে হয়। যতই ওপরের দিকে এঞ্জিন চলে, ততই চারদিকে বিরাট মৌনজাল ঘিরে আসে। সমতলের এই একান্ত মৌনতা গাম্ভীর্যের চিহ্ন। জানতে গিয়ে কিছুই জানা যায় না। প্রকাশ করতে গিয়ে সবাই যেন অন্তরে লীন থেকে আনন্দ পেতে চায়। দেখতে না দেখতেই আধ ঘণ্টার মধ্যে ট্রেন চ'লে গেল তিনধেরিয়ায়। এই স্টেশনের চারিদিকে একই চিত্রের বিচিত্র পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। শুধু অবাকই হই নি, এ আনন্দের যেন শেষ নেই—দেখলেই দেখবার স্পৃহা বাড়ে, জীবনের নূতন দীক্ষা হয়। পাহাড়ী ছেলে-মেয়েদের গায়ের রং দেখে ভাবতে লাগলাম—আমাদের সমতল ভূমির ছেলে-

মেয়েদের এমন সুন্দর ও সবল দেহ হয় না কেন? পাহাড়ী ছেলে-মেয়েরা বড় বড় বোঝা নিয়ে ওপরে ওঠে, নীচে নামে। তাদের গায়েই যেন লাগে না। ছেলে-মেয়েদের শরীর কৃত্রিম অবস্থায় যে তৈরি হতে পারে না, তা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল। রোদ বৃষ্টি মাটির ভয়ে আমাদের ছেলে-মেয়েদের ঘরের মধ্যে কোণঠাসা করি ব'লেই আমাদের ছেলে-মেয়েরা প্রকৃতি থেকে সার জিনিস চলাফেরার ভেতর নিতে পারে না। কাজেই কৃত্রিম অবস্থায় অকৃত্রিম আনন্দ পাবে কি ক'রে? সামনে কুয়াসায় সব মৌন হয়ে আছে—ধাপে ধাপে নেমে গেছে পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, তার মধ্যে পায়রার খোপের মত ছোট ছোট কুটীর ও বাংলো। নীচের দিকে তাকালে মনে হয়, ওপরে যে আছি তার মূলে কে? প্রকৃতি ও মানুষ।

হঠাৎ এক কাপ চা ও চারখানা রুটি হাতের কাছে এল।

আমি চায়েতে অভ্যস্ত নই। আমার সঙ্গে ঘরের তৈরি জিনিস আছে।

আপনি তো আমাদের দেশের লোক, এই সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ করবেন না?

উপহারের পরিণামে তো অশ্রুহার সম্বল হয়। আমরা তো উপহার দিই আদায় করবার জন্যে, উপহারের জন্যেই উপহার দিলে নেওয়া চলে, দেওয়া চলে।

ভদ্রলোকটি অপ্রস্তুত হলেন, কিন্তু আরও কয়েকটি কথা শুনে ট্রেন ছাড়বার কালে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

উদারতা যাঁদের নেই, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যাঁদের থাকে প্রবল, একগুণ দিয়ে চতুর্গুণ আদায় করবার লোভ যাদের ভেতরে ভেতরে থাকে, তাঁরা যেন কখনও দান না করেন বা উপহার না দেন। তাঁদের

ভালবাসার কোন দাম নেই। তাঁদের উপকারের কোন সার্থকতা নেই।

ভদ্রলোকটি চা-বিস্কুটের দামটি নিয়েই খুশী হলেন। আর উপহার দিতে চাইলেন না। বুঝতে পারলেন, উপহার দিতে গেলে বা পেতে গেলে স্পৃহাহীন বা লোভহীন হওয়া চাই।

আমার এই চমৎকার উপসংহারের কারণ জানতে চাইলেন। কামরায় আরও দুজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁরাও এর কারণ জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

আমাদের দেশে কৃপণ ধনীরা দু আনা চার আনা দান ক'রে সময়-সুযোগ পেলে তার শতগুণ আদায় করে, চারদিকে অসহায় অবস্থায় দানের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিয়ে এই উপসংহার করেন—এ দানের কি প্রতিদান আছে? তখন চার আনা আট আনা ছিল অনেক। আমাদের দেশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী—স্বামী-স্ত্রী নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে ভালবাসার বা উপকারের একটা শো দেখান, কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আটকাতে চান। যেই স্বার্থটি আদায় হয়ে গেল বা স্বার্থ আদায়ে ব্যাঘাত হ'ল, তখনই তাঁরা বাজে দোষ দেখিয়ে বা দুর্নাম রটিয়ে তাদের উন্নতির পথ নষ্ট করেন। অনেকে আবার ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে পড়াবার জন্যে একটা ভালবাসার এবং প্রশংসার প্রদর্শনী খোলেন—মিষ্টি কথা, মিষ্টি ব্যবহার, আদবকায়দায় একেবারে লেফাফাদুরস্ত। তাদের উপহার দিয়ে বা উপকার ক'রে বিপদই বাড়ে এবং ভয়ঙ্কর অনিষ্টও ঘটে। তারা ভিতরে থাকে অত্যন্ত লোভী এবং বাহিরে থাকে অত্যন্ত সহজ সুলভ! এই সব স্বার্থপর লোভীদের হাতে পড়লে তাঁরা ভিতরে ভিতরে উন্নতির সমস্ত পথ নষ্ট ক'রে দেন অথচ তাঁদের ষোল আনা আদায় ক'রে নেন, সামান্য ঘটনা উপলক্ষ্য

ক'রে লাঞ্ছিত করতে থাকেন, অপমান করতে থাকেন এবং মনুষ্যত্বের অবমাননা করেন। এই সব প্রশংসাপ্রিয় ভদ্রলোক বা ধনীলোক মনের বা হৃদয়ের গভীরতার, প্রসারতার বা আন্তরিকতার মূল্য একেবারেই দিতে জানেন না, যার-তার সঙ্গে তাল রেখে সাধু এবং হিতৈষী কর্মীকে খাটো করেন। তাঁদের মত বন্ধুর চেয়ে শত্রু অনেক ভাল। অপরিচিত অনেক ভাল। জীবনে তাঁরাই উপকার করেন সব চেয়ে বেশি, যাঁরা দান করেন কিন্তু উপকৃতের নামটি পর্যন্ত ভুলে যান, যাঁরা উপহার দেন কিন্তু বিনিময়ে না দিলেই সন্তুষ্ট হন, দিলে পরেও সেই কথা ভাবেন না, উপকার করতে গিয়ে কৃতার্থ করেন না, ধন্যও করতে যান না, যাঁরা সামান্য উপকার পেয়ে অতি গোপনে অজ্ঞাতসারে তার অনেক বেশি দিয়ে যান, তাঁরাই উপহার দিতে পারেন বা দান করতে পারেন।

আপনি কি অন্তর থেকে তাই করেন নি ?—একজন বেশ হাসিমুখে জানতে চাইলেন।

আমার জীবনে আমি কোন দান বা উপহার পাবার উদ্দেশ্যে দিই নি। আমার জীবনে এই লোভটি নেই ব'লেই আমি খুব শান্তিতে থাকি, ঘুম হয় ভাল, কাজ করতে পারি দিনরাত—কোন চাকর চাকরানী বা কোন আত্মীয়কে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ঠকাই নি, বরং নিজে ঠকেছি।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারেন? আমাদের কয়েকটি সত্য আপনার কাছ থেকে জানবার কৌতূহল হচ্ছে।

আমাদের প্রতিবেশী (ঘরের পাশের লোক) আমাদের বাড়ির সীমানার অনেক জায়গা জোর ক'রে নিয়েছে, অনেক অনিষ্ট করেছে, সত্যকে মিথ্যা ক'রে বাবা-মাকে অপমানিত করেছে, আঘাতও দিয়েছে। আমি সেই সীমানার ধারের এক অংশ কিনে দেখলাম, সেই পরম

হিতকারী প্রতিবেশীর বসত-ঘরের জায়গা আমার প্রাপ্য হয়। আমি হাসিমুখে তাদের জায়গা তাদের দিয়েছি এবং সীমানার যে জায়গা নিয়েছে তাও চাই নি। বাবাকেও এই ব'লে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম—এমন সুযোগ পেয়ে এই সব জঘন্য শত্রুর অনিষ্ট ক'রে লাভ কি? ওদের কাজই উত্তমের নিন্দা করা, হেয় করা ও দুর্নাম করা।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। গ্রামের লোক কয়েকটি দুর্বৃত্তের চক্রান্তে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। মিথ্যা মোকদ্দমা করে, যেখানে সেখানে ভাল ভাল লোকদের লাঞ্ছনা, অপমান, তিরস্কার করে। ম্যাও ধরবে কে? সেই সব দুর্বৃত্তদের 'রিং-লীডার'কে বেশ ভালভাবে সায়েস্তা ক'রে দেবার পর মোকদ্দমা হয়। উল্টে তার জরিমানা হয় এবং মোকদ্দমায় সে হারে। পরে দেখা গেল, যে কজন লোকের জন্য আমাকে দাঁড়াতে হ'ল, তাঁদেরই একজন মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আমাকে কারাগারে পাঠাবার চেষ্টা করলেন।

কোন এক ছাত্রকে পড়াবার জন্য নিযুক্ত হলাম। আদর সমাদর করা হ'ল। কদিন পরে দেখা গেল, একটির জায়গায় আরও দুটি এসে হাজির। তখন 'না' করবার জো থাকে না। সেই তিনটিকে পড়াতেও কোন বাধা থাকে না, যদি ঐ আদর-সমাদরের সঙ্গে আন্তরিকতা থাকে। প্রয়োজনের খাতিরে ঐটুকু হয় ব'লেই শেষকালে ঐসব জাতীয় আদর সমাদর খচ খচ ক'রে হৃদয়ে বেঁধে।

তাই বলি, কোথায় বা আছে উপহার, কোথায় বা আছে আন্তরিক স্নেহ, কোথায় বা ভালবাসা! যাঁরা আদান-প্রদানের মধ্যে থাকেন না অথবা আদান-প্রদানের মধ্যে থেকে একেবারে নিস্পৃহ বা নির্লোভ বা নির্লিপ্ত থাকেন, তাঁরাই উপহার দিতে পারেন, নিতে পারেন, দান করতে পারেন এবং স্নেহ ভালবাসা দেখাতে পারেন। এদিকে প্রকৃতি

মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। প্রাচুর্যের সম্পদ নিয়ে সেই বিশ্বজননী দান করেন, উপহার দেন এবং স্নেহ-ভালবাসা দেখান। আমাদের মা তাঁরই প্রতীক, মূর্তিমতী হয়ে আমাদের সামনে আছেন। আমরা তাঁর মর্যাদা রাখবার জন্যে কি করি ?

তিনধেরিয়ার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য মনকে মুগ্ধ করে, মাঝে মাঝে মাতালও করে। উপরে নীচে, ডাইনে বাঁয়ে যেন মেঘের খেলা, পাথরের খেলা এবং পাহাড়িয়াদের ও বাঙালীদের অপূর্ব আত্মীয়তার খেলা। মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, তাতে তাদের বন্ধন ছিন্ন হয় না বরং দৃঢ় হয়।

২০০০ ফুটের উপরে যখন ট্রেন উঠে গেল তখন মনে হ'ল, বিরাট দৈত্য যেন পাহাড়ের ভিতরে আগুন লাগাচ্ছে, উপরে ফাটল বা গর্ত নেই। সাদা সাদা ধোঁয়াগুলো কুয়াসার আর এক মায়াজাল রচনা ক'রে উপরের ভাগ থেকে উঠছে, তারই মধ্যে রোদ, মেঘ ও কুয়াসার খেলা। গায়ের উপরে সাদা মেঘ, বাইরে সাদা মেঘ, মেঘের বিচিত্র খেলা। সমস্ত জগৎ যেন মেঘে আচ্ছন্ন। প্রকৃতি যেমন বিচিত্র পরিবর্তন নিয়ে তার কাজ ক'রে যায়, আমরাও আমাদের মনের ও ভাবের বিচিত্র পরিবর্তন নিয়ে একটা দৃশ্য থেকে আর একটা দৃশ্যে, একটা পট-পরিবর্তন থেকে আর একটা পট-পরিবর্তনের দিকে চলেছি। মন তখন ভ্রান্ত নয়, উদ্‌ভ্রান্তও নয়, গভীরও নয়, গম্ভীরও নয়, কল্পিতও নয়, কাল্পনিকও নয়। দেহ আছে দুই ফুট পরিমিত স্থান ও সীমা নিয়ে, আর মন চলেছে আকাশে-বাতাসে পাহাড়ে-পাথরে ক্ষুদ্রে ও বৃহতে। কোথায় তার সীমা ? কোথায় তার শেষ ? মন যখন অবলম্বন পায় তখনই তার উদারতা আসে, প্রসারতা বাড়ে এবং সত্য ও সৌন্দর্যকে গ্রহণ করে ভাবের কবিতায়—

"অপরিচিতের এই চির পরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়,
সে-কথা বলিতে পারি এমন সবল বাণী
আমি নাহি জানি।"

যা দেখি তা যেন নিবিড় হয়ে আসে, আর যা দেখি না তা "বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা" দিয়ে মনে প্রাণে করে ভিড়। তিনধেরিয়ার মেঘভরা কুয়াসার রঙিন আকাশ, পাহাড়ের নিবিড় ছায়া, বিরলবিস্তৃত লোকালয়, সুদীর্ঘ পাথরের পথ-ঘাট, তরুশ্রেণীর মাঝে নিঃশব্দ মেঘালয়, শূন্য নদীর পারে উদাসীন ও আগত সন্ধ্যা—মর্ত্যের স্বর্গের বিচ্ছিন্ন অশ্রুবাদল বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে 'কোথা মোর দার্জিলিং স্বর্গ ?' কোথা সেই সংসারীর শান্তিনিকেতন ? কোথা সেই পান্থভবন—সে তো লোকহীন, হৃদিহীন, স্বর্গভূমি নয়। কল্পনার নয়নে উপলব্ধি করলাম—দার্জিলিং স্বর্গ নয়, সেও মর্ত্যভূমি। সেখানেও অশ্রুজলধারা আছে, সেখানেও হত ক্লান্ত আহত ও অভাজন স্নিগ্ধ কোমল বায়ুর স্পর্শে হৃদয় জুড়িয়ে সুখের দুঃখের অনন্তমিশ্রিত স্নেহধারা লাভ করে। সেই পর্বতের গুহায় গুহায় নিশ্চয়ই অমৃত ঝরছে। গগনমধ্যে ঝনঝন ঝঙ্কারে অসীমের বাদ্য বাজছে। দশ দিকে তাল পড়ছে, বেতাল জাগে,—সেই সুরের আঘাত আমার প্রাণে লাগছে। সমস্ত শরীর বিদ্ধ হচ্ছে। তিনধেরিয়া থেকে কার পত্র এসে মনের মধ্যে অক্ষরগুলি লিখে গেল ! এ পত্রে তো জানা খবর নেই, শুধু অজানার অগম্য খবর ব্যাকুল ক'রে প্রাণ মন ছেয়ে ফেলেছে। পত্রের মর্ম এই—সেই উঁচু অট্টালিকায় অধিকার পেতে হ'লে লজ্জা ছাড়তে হবে, তার সঙ্গে হৃদয় মেশাতে হবে। নয়নে প্রেমের আরতি সাজাতে হবে। ব্যাকুলতা যদি না থাকে, তবে বৃথা

আমার অভিসার, বৃথা আমার সাজসজ্জা। সেখানে পথ গম্য-অগম্য, বিনা মেঘেও সেখানে দামিনী চকিত হবে। অমৃত-বৃষ্টি মাঝে মাঝে হবে, বিনা প্রদীপে জ্যোতি জ্বলবে, গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল ফুটবে। চকোর যেমন চাঁদিমার আলোতে চিত্ত সমর্পণ ক'রে ব'সে থাকে, চাতক যেমন স্বাতী নক্ষত্রের ধারায় মন সিক্ত করে, আমার মনও তিনধেরিয়ার পর থেকে সেই দার্জিলিঙের মেঘের খেলা দেখবার জন্যে, পাথরের ও পাহাড়ের মুরলী-শব্দ শোনবার জন্যে ছুটেছে কোন্ অজানা গানের সুরে—

"এস আজি নগরাজ
ভেঙে দাও সব কাজ
প্রেমের মোহন মন্ত্রে।
হিতাহিত হোক দূর—
গাব গীত সুমধুর,
ধরো তুমি ধারা সুর
সুধাময়ী বীণাযন্ত্রে।"

এখন আর সেই রাজপথ, সেই গৃহ-অরণ্য, জনতারণ্য নেই। এখন আর তপনতপ্ত ধূলির আবর্ত নেই। এখন শুনতে পাচ্ছি তিনটি ঝরনার অফুরন্ত প্রশান্তধ্বনি—বিরক্তি নেই, ব্যথার ক্রন্দন নেই, শান্তির স্নিগ্ধধারা অনন্তকালের স্রোতে চলছে। সবই সাদা, সবই বাষ্পের মত শূন্যময়, আবার সবই শূন্যের মত একেবারে ফরসা। ওপরে উঠছি আর চারিদিকে মেঘ-কুয়াসার খেলা দেখছি নয়নভরে।

হঠাৎ একটি পাহাড়িয়া চীৎকার ক'রে জানাল—বাবুজী, গরম জামা পরো।

তাই তো, শার্টের ওপর শার্ট, কোটের ওপর কোট, চাদরের ওপর

চাদর। শীত জমাট হয়ে আসছে। নাকটি ছাড়া সর্বাঙ্গ ঢেকে রইলাম। তবু তো শীতের ভাব কমে নি। চোখ খুলে দেখলাম, ৪০০০ ফুট ওপরে—মহানদী স্টেশন। চারিদিকে প্রলয়কালীন মেঘের সাজ—সামনের দিকটা মহাশূন্য—সাদা ধুননো তুলোর মত সাদা সাদা ধোঁয়ার খেলা। এখানে তো যেমন শীত তেমন বসন্ত, যেমন আলো তেমন ছায়া, যেমন পাথর তেমন পাথার। এখানে পরিবর্তন হচ্ছে মিনিটে মিনিটে। কোথায় সেই সমতল পল্লী আর নগরী! নগরীতে রয়েছে করুণ রোদন, কারণহীন দম্ভ, ব্যাকুল প্রয়াসের সঙ্গে রয়েছে বিনীত দাস্য এবং নিষ্ঠুর হাস্য। চারিদিকে ক্ষুধার দাহন জ্বলছে, লোভের যজ্ঞকুণ্ড সংগ্রাম করছে। বহ্নির মুখে জীবনের আহুতি হচ্ছে। কেউ দিচ্ছে অস্থি, কেউ দিচ্ছে রক্ত, আর কেউ দিচ্ছে উষ্ণশ্বাস। কৃত্রিম ও কুটিল দহনরঙ্গে পতঙ্গের মত সবাই জীবনের সার সত্য ফেলে দিচ্ছে। নগরী যেন মানবের পাষাণী ধাত্রী—উন্মত্ততা ও মত্ততা নগরবাসীকে ক্ষিপ্ত ও মাতাল করেছে। নগরীর সুখ-দুঃখের চক্রের মধ্যে পল্লীর শান্তি কোথায়? পল্লীর বেড়া ছিল নগরী। এখন নগরীই বেড়া হয়ে পল্লীর ক্ষেত্রকে খাচ্ছে। পল্লী আজ শ্মশান। সমাজের উদাসীন নিষ্ঠুরতার এবং নগরীর অশান্ত ও অবাধ্য বিজয়বাদ্যের নির্মম ও নৃশংস উচ্ছৃঙ্খলতায় পল্লীর সম্পদ নিঃশেষিত হচ্ছে। পল্লীর সেই তৃপ্তি, দীপ্তি ও শক্তি শেষ হচ্ছে। সব আলো নিবে গেছে। পথ নেই, পান্থ নেই, বাসা নেই, বাঁধন নেই—সব যেন ছিন্ন-ভিন্ন ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত।

সন্ধ্যার পূর্বরাগ মহানদীর গায়ে পড়ছে। রঙের নেশায় যেন তার আশা মেটে না। চোখের কালোতে নূতন আলো ঝলক দিয়ে উঠছে, নূতন হাসি যেন ফুটেছে। অন্য দিকে পল্লী ও নগরীর মাঝে—

"দুঃখেরে দেখেছি নিত্য পাপেরে দেখেছি নানা স্থলে
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে ;
মৃত্যু করে লুকোচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।"

৪১২০ ফুট উপরে কি মহাশান্তি! কি মহাশক্তির গাম্ভীর্য! কি অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ! এখানে ক্রন্দনে কলরোল নেই। রক্তের কল্লোল থেমে গেছে। মরণে মরণে আলিঙ্গন নেই। মনে হয় পুরানো সঞ্চয় নিয়ে বেচাকেনা আর চলবে না। সত্যের পুরানো পুঁজি ফুরিয়ে গিয়েছে। মহানদী বহুদূরে—নূতন সমুদ্রতীরে তুফানের মাঝখানে জীবনতরী বেয়ে নিতে হবে। মৃত্যু ভেদ ক'রে সোনার তরী চলবে।

"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর!"

পরিষ্কার হয়ে গেল সমস্ত আকাশ। কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। ঘন-কালোর ছায়ার মলিনতা নেই। দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সত্য নূতন ভাবে দেখা দেবে, পাপ নিজের লজ্জায় ম'রে যাবে, ধনবিজ্ঞানের অহংকার ভেঙে পড়বে। মানুষ যেখানে সীমা অতিক্রম ক'রে রক্তস্রোতে অশ্রুধারা প্রবাহিত করছে, দেবতার অমর মহিমা সেখানে পূর্ণভাবে দেখা দেবে। প্রকৃতির গায়ে লেখা রইল—প্রবলের উদ্ধত অন্যায় লুপ্ত হবে, লোভীর নিষ্ঠুর লোভ শুদ্ধ হবে, বঞ্চিতের অপমান দেবতার সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হবে। নিদ্রিত পুরী, নির্জন ঘর ছেড়ে চলেছি আরও উপরের দিকে—ইঞ্জিন টানে গাড়িকে আর মন টানে মঙ্গলকে। মঙ্গল চায় নূতন দেহ, নূতন মন, নূতন আশা, নূতন আলো। পেছনের দিকে চেয়ে দেখি অবলম্বনহীন হয়ে ফেরবার পথ নেই, সামনে দেখি সব যেন

শূন্য অথচ শান্ত, পূর্ণ অথচ রিক্ত, ব্যাপ্ত অথচ নির্লিপ্ত।—আমি যে মিথ্যা নই, আমার ইহকাল যে মিথ্যা নয়, আমার সত্যও যে মূল্যহীন নয়, তার একটা স্বরূপ প্রকাশিত হ'ল।

"তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।"

প্রায় ৫০০০ ফুট উপরে কার্শিয়ং। তখন প্রায় ছটা। অকাতর দেহ নিয়ে এক সুখ-নিদ্রার ঘোরে মগ্ন রয়েছি। এখানে আরতির বেলা আর আসে না। অসংখ্য প্রদীপও জ্বলে না। সন্ধ্যার আলোকের আর রবির শেষ শান্তিরশ্মির অপূর্ব মিলন হয়। ক্লান্ত ভুবনের নিষ্ফল বিলাপ এখানে পৌঁছয় না। ক্ষীণ পল্লবহীন ঝাউগাছের ও শালগাছের কম্পনসুর—'সীমার মধ্যে অসীমে'র জাগরণ' এনে দিচ্ছে। এখানে পাথরে পাথরে যোগাযোগ, মেঘে মেঘে মিতালি, সুরে ও স্বরে গভীর পরিচয়। মানুষ সমাজের জীব—মিলনের বোধই ঐক্যের ও আত্মীয়তার বোধ। এই কার্শিয়ঙে পাথরের সম্মিলিত ঐক্যবোধ মানুষের বাঁচবার পথ জানিয়ে দিচ্ছে। মানুষের বৃহৎ দেহটাই তার আত্মা—দেহ অবিচ্ছিন্ন থেকেই সমগ্র সত্যকে গ্রহণ করতে চায়। আত্মীয়তার সূত্রেই মানুষ আপনাকে পেতে পারে। যেখানে তার মধ্যে জন্তুর ধর্ম প্রবল, সেখানে বিপ্লব বা বিদ্রোহ দেখা দেয় না—দেখা দেয় স্বেচ্ছাচারিতা, স্বদেশদ্রোহিতা, ব্যভিচারিতা। তখন ভালমত মেলবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। পথের দুধারে দুয়ার যেন রুদ্ধ। সারা দেশে যেন কোন সাড়া নেই, চিত্রিতবৎ যেন সমস্ত নির্জন পথ। থেকে থেকে তো আর কুকুরের ডাক আসে না, প্রাসাদের শিখরে গম্ভীর স্বরে আর প্রহর-ঘণ্টা বাজে না। কার্শিয়ঙের পূর্বদিকে হঠাৎ দীপের

আলোকরাশি দ্বিগুণ আভায় জ্ব'লে উঠল। নীচে কঠিন ভূতল, উপরে অতল বাষ্পলেখা—

"অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই
অপরূপ এক স্বপ্ন সমান, অর্থ কিছুই নাই।"

কোথাও পাষাণমূর্তি পাথরের গায়ে চিত্রিত, কোথাও চিত্রিত মেঘ আকাশের গায়ে অবগুণ্ঠিত। আঁধারে আঁধারে শিলার স্তম্ভ—তার মাঝে মাঝে খোদিত ভাঙা বাড়ি, তার মাঝে মাঝে পাথরের ঢাকা। নিষ্কম্প প্রদীপ। দুই-একটি অপরূপ পাখি বহু দূরে দেখা গেল, দুই-একটি নারী পিঠের উপর বোঝা নিয়ে এধারে ওধারে চলতে লাগল—সে লোক নেই, কোলাহল নেই, প্রহরী নেই, পাহারা নেই, দাসদাসী অত্যন্ত বিরল। "আমি যে বিদেশী অতিথি, আমায় পরিহাসে কি লাভ!" সহসা নানাবর্ণের আলোক, নানাবর্ণের ফুল—চোখের সামনে ফুটে উঠল, কিন্তু মেঘে ও কুয়াসায় ঢেকে গেল সব দিক।

যতই ওপরের দিকে চলেছি, ততই মন যেন ঘুমের ঘোরে আবিষ্ট হচ্ছে। জলের মধ্যে যেমন মৎস্য ডুবে থেকে স্বেচ্ছায় অবাধে বিচরণ করে অথচ বাইরের জগৎ তার কিছুই খবর রাখে না, আমার মন সেই সমস্ত বিচিত্র পাহাড়ের অবাক চিত্রের মধ্যে চিরসুন্দরের রূপে মুগ্ধ হয়ে আছে। আজকে সন্ধ্যার প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গে উদয় এবং অস্ত এক ব'লে মনে হ'ল। উদয়ের পথে দ্বন্দ্ব মিটে যায়, সেবা আরম্ভ হয়, আয়োজন চলে এবং কাজ চলতে থাকে; অস্ত যাওয়ার পথে বিশ্রামের ও সমাধির বুকে জন্ম নেয় নূতন প্রভাত, নূতন আলো এবং নূতন জীবন। যেখানে অস্ত নেই, সেখানে উদয় নেই; যেখানে আঁধার নেই, সেখানে আলো কোথায়! ধাপে ধাপে উপরের দিকে এঞ্জিন চলছে

আর সবই যেন নূতনরূপে দেখা দিচ্ছে। অন্তরের মধ্যেই চন্দ্র সূর্য প্রকাশিত, আনন্দের মধ্যেই আত্মা উদ্ভাসিত, সত্যের বীর্যেই সাধক বেগবান এবং হৃদয়বান।

হঠাৎ অস্বাভাবিক শীত অনুভব করলাম। সম্বল যা ছিল সব মুড়িয়ে নিয়ে দেহটাকে চেপে নিলাম, তবু তো শীতের চাপ কমছে না! কানে ফুসফাস শব্দ এল, টাং, এলিভেশন—৫৬৫৬ ফুট। সন্ধ্যার গাঢ়তা তখনও শেষ হয়ে আসে নি, জনসমাজের জনহীন আভাস তখনও লোপ পায় নি। এই অখ্যাত ও অজ্ঞাত স্থান থেকে ট্রেন উঠে গেল প্রায় ৮০০০ ফুট উপরে। দার্জিলিঙে যাবার পথে এই স্টেশনটিই সবার উপরে। 'ঘুম' স্টেশনের উচ্চতাকে প্রথমত আমার প্রণাম জানালাম। প্রণাম জানালাম মানুষের কীর্তিকে এবং বিচিত্র-কীর্তির স্রষ্টাকে। প্রকৃতিকে মানুষ কাজে লাগাবার জন্যে কত আয়োজন করেছে! প্রকৃতিও মানুষের সাধনাকে সিদ্ধির পথে চালিত করবার কত পথ তৈরি করেছে। এই 'ঘুম' থেকেই একটু এগিয়ে গিয়ে 'সত্য ও সুন্দরে'র দর্শন মেলে যার ভাগ্যে থাকে। অদূরে "টাইগার হিল"—টাইগার হিলেই কোন কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যে মেলে "Beautiful and perfect sun-rise"। কতদিন পরে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখব। একে দেখাই যে সবচেয়ে কঠিন। চাতকের যেমন বৃষ্টির জলের পিপাসায় প্রাণ ফেটে যায়, তবু অন্য জল তার রোচে না, মৃগ যেমন সংগীতের সুরে আকৃষ্ট হয়ে সংগীত শোনবার জন্যে প্রাণ দেয়, সতী যেমন সত্যের আসনে ব'সে প্রিয়তমের পথ অনুসরণ করে, 'ঘুম' স্টেশন থেকে মন সেই প্রিয়তম পথ দিয়ে প্রিয়তমাকে দর্শন করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল। মনের মন্দিরে কার বাদ্য যেন বাজতে লাগল,—কবে এই সুন্দরের, এই

চিরবসন্তের, এই চিরনবীনের দর্শন মিলবে? কবে প্রত্যক্ষ করব—

"ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।"

এখন সময়ও নয়, এখন সে পথও খোলা নয়। এখন উদ্দেশ্য ও উপায় এক সূত্র ধ'রে যেখানে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই দার্জিলিংকে মনের মতন ক'রে আগে দেখে নেব, প্রাণের মতন ক'রে পেয়ে দেখব। আর জানতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাওয়াটাকে যোগ ক'রে নেব। শিক্ষককে জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ভ্রমণ-বিজ্ঞানের সঙ্গে সজীব ক'রে নেব। এতদিন বুদ্ধির জড়তা পাকিয়ে কৌতূহলকে কত দুর্বল ক'রে ফেলেছি।

ঘুম স্টেশনের পর থেকেই সমস্ত তন্দ্রার ভাব কেটে গেল,—কৌতূহলের জাগরণ এল। যে দার্জিলিংকে দেখবার জন্য তনু মন ধন বাজি রেখেছি, তাকে তো শুধু দেখেই যাব না—দেখবার মতন দেখব, পাবার মতন পাব, রাখবার মতন রাখব। এর মায়া তো ত্যাগ করা যায় না। অসংখ্য মায়ার বন্ধন ছিন্ন ক'রে এই পবিত্র সৌন্দর্যের ও সত্যের মায়াতে ডুবতেই হবে। কামকে ত্যাগ ক'রে ক্রোধকে পাই, ক্রোধকে ত্যাগ ক'রে লোভকে পাই, লোভকে ত্যাগ ক'রে অভিমান-অহংকার পাই। সবাইকে ত্যাগ ক'রে প্রকৃতিকে পাই। প্রকৃতির ঘরেও আবার নূতন যোগ, নূতন ভোগ, নূতন তত্ত্ব, নূতন যুক্তি এবং নূতন মুক্তি পাচ্ছি। উন্মনা হয়েই প্রকৃতির বাহির-ভিতর জানতে হয়, পরমতত্ত্বকে ধ্যান করতে হয়, অসীম রাগিণীকে বাজিয়ে প্রেম ও বৈরাগ্যকে সঙ্গত করতে হয়।

"তোমার ঐ অনন্তমাঝে এমন সন্ধ্যা হয় নি কোনো কালে,

আর হবে না কভু।
এমনি ক'রেই প্রভু,
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।"

দেখা দিল দার্জিলিং—শীতের চাপে, কুয়াসার প্রহেলিকায় এবং রাত্রির ঘনগভীর তমসার আড়ালে। "বেঁচে থাকতেই তাকে দেখে নাও, আকাঙ্ক্ষা ক'রে লও"—চেয়ে দেখলাম চারদিকে। কোথাও আলো নেই। গুটিগুটি ক'রে এসে একটি কুলি আমার সামান্য ওজনের মালবোঝাটি নিয়ে "স্নো ভিলা"তে থামল। কুলিকে বিদায় দিয়ে সহজভাবে খাওয়া শেষ ক'রে নিলাম। বের হবার সাহস হ'ল না প্রথম দিনের রাত্রিতে। আগে দিনের বেলায় সব জানতে হবে, তারপর চলতে হবে পথে-পথে, এদিকে-ওদিকে। এত যে সুন্দর, তাকে এত সহজে দেখে লাভ কি? এত সহজে পেয়ে লাভ কি?

"অতিথিরে ডাকবি যদি
ডাকিস যেন সগৌরবে।"

আজ তো গেল। কাল আসুক।

আমার ঘুম সহজে আসে, সহজে ভাঙে—তাই সমস্যা হয় কম। প্রতিধ্বনি হ'ল ঘুমের ঘোরে "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought"।

শনিবার রাত্রির নির্জন গৃহে একা একা মোমবাতির আলোতে নিশীথ চিন্তার স্রোত ব'য়ে যেতে লাগল। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত গভীর রাত্রিতে জেগে কাজ করবার অভ্যাস ক'রে নিয়েছিলাম। জানি, প্রকৃতির নিয়মের বাইরে চললে দুঃখ পেতে হবে আমাকেই—তবু এ অভ্যাস থাকবেই। সকাল ছটা থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত

সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম ক'রে গভীর রাত্রিতে যা কিছু পড়বার পড়তে হয়, ভাববার ভাবতে হয়। হোটেলে এল আমার সেই সাধনার গভীর রাত্রি।

শনিবার (১৬-৫-৪২) কেটে গেল। একটা কাজের দিনে কত কিছু পেলাম। ভ্রমণের সময় কেবল দেহটাই ভ্রমণ করে না, মনও সীমার থেকে অসীমে অজানার বাঁশির সুরে আপনার অজ্ঞাত সুর মিলিয়ে নিয়ম-অনিয়মের বেড়া পার ক'রে চলে। কার শঙ্খ যেন বেজে ওঠে! কোথাও ক্রন্দনের ধ্বনি ফিরে ফিরে আসে। আবার শূন্যতলে প্রশ্ন হয়—আরো কোথা! আরো কতদূর! দিন যায়, সন্ধ্যা নেমে আসে—আবার ভোরের বেলায় সেই পাখির ডাক, ফুলের হাসি, শান্ত মৌন পথিকের উদাস জাগরণ আসে ধরণীতে। আবার সব দিক অন্ধকারে ঢাকে, বন-উপবন বিরহের উদাস বাতাসে কেঁদে ওঠে—সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টির আকাশতলে, ধূসর মলিন রাজপথে দেখা দেয় অপরূপ বেশ, নূতনতর আচার। কোথাও বা পুরাতন জীর্ণতাকে আঁকড়ে ধ'রে পাথরের চিরবাধাগ্রস্ত শ্যাওলার তলে আবদ্ধ হয়ে আকাশের মর্মমূলে বিদ্ধ হচ্ছে, আবার কোথাও বা নূতন কায়াহীন বেগে শব্দহীন সুরে পথের আনন্দবেগে নূতন পথ তৈরি ক'রে চলছে। 'নূতন' সম্মুখের বেগ নিয়ে চঞ্চল আকুল হয়ে চলেছে। সেখানে রয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত, ঝুপির মাঝে জাগরণের অনন্ত পিপাসা,—সুখ-দুঃখের আনন্দ-বেদনার অসীম ভাষা।

কে সে? তাকে তো জানি নি! তাকে তো চিনি নি! এত কষ্টের সংসার আমার। সংসারের এত ক্ষুদ্র উৎপীড়ন—মিথ্যা দুর্নাম, মিথ্যা অবিশ্বাস; তারই মধ্যে কেন এ নূতনের আহ্বান! কেন

বাঁশিতে বাঁশিতে নূতন সুর! কেন সুদূর—আর নহে সুদূর। কেন পাহাড়ে পাহাড়ে পত্রে পত্রে শুনেছি গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি!

রবিবার (১৭-৫-৪২) দেখা দিল। হোটেলে এক মিনিট থাকতে ইচ্ছে হ'ল না। মন যেখানে স্থান পায় নি, সেখানে আর দেহ কি ক'রে থাকে? রাত্রির থাকা-খাওয়ার প্রাপ্যটি-চুকিয়ে দিয়ে ম্যানেজারকে 'নমস্কার' জানালুম।

একটা কথাও না ব'লে চ'লে যাচ্ছেন?

এক রাত্রি থেকে ভোরে না ব'লে চ'লে যাওয়াটার মধ্যে অনেক বলা আছে।

তবু কিছুটা জানতে ইচ্ছে হয়। কারণ আপনি তো এখানে খাবারটি খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন এবং ভোরের বেলায় টিফিন না খেয়েই রওনা হচ্ছেন!

ম্যানেজারবাবু! মনের তাগিদে আমি সব সময় চলি। কাল রাত্রে আপনাদের কাউকে জিজ্ঞেস না ক'রেই টের পেলাম, আপনাদের এখানে মিথ্যা, মেকী, বঞ্চনা, আবর্জনা ও জঞ্জালের আদর বেশি। খাঁটির আদর নেই, সত্যের খুঁটি নেই—কাজেই কারবার বেশি দিন চলবে না। আপাতত কদিন ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে চালাবেন মাত্র।

কাজ-কারবার এত খাঁটি সত্য নিয়ে চলে না।

বলেন কি ম্যানেজারবাবু? আমার তো ধারণা, কাজ-কারবারেই সত্যের মূলধন দরকার খুব বেশি। তাই কেন? ঘরে বাইরে, দেশে বিদেশে, ইস্কুলে কলেজে, হোটেলে হোস্টেলে—সর্বত্র খাঁটি জিনিসের দরকার। আমাদের গ্রামের ব্যাঙ্কটিতে যে দিন ভেজাল ঢুকে গেল, সেই দিনই মারা গেল। দেশের কত ছোট কারবার খাঁটি লোকের অভাবে শেষ হয়ে গেল। আমাদের ধর্ম, চৈতন্যের ধর্ম, পরমহংসের ধর্ম,

বুদ্ধের ধর্ম—সবই যে খাঁটি মানুষের, সত্যিকারের মানুষের অভাবেই শেষ হয়ে গেল। আমাদের দেশের কোন প্রতিষ্ঠানই টেঁকে না—কয়েক বছর ভালভাবে চালাবার পরই প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্তা নিজেরা স্বার্থে মগ্ন থাকেন, নিজের দলের প্রতি অন্ধ প্রীতি দেখান, অন্য দলের সবচেয়ে ভাল মানুষকেও মানুষ ব'লে মনে করেন না। কাজের লোকদের দাবিয়ে রাখেন, মিথ্যা দুর্নাম ক'রে বা বাজে চাল দিয়ে তাদের অকর্মা ও অচল ক'রে রাখেন। আপনি সামান্য একটি লোকের কথা স্বর্ণাক্ষরে অন্তরে লিখে রাখুন—এ দেশ যখন স্বাধীন হবে, তখন হবে দলাদলির দেশ। এ দেশ যখন স্বাধীন হবে, তখনও মানুষের মত মানুষ পাওয়া যাবে না, সমাজের মত সমাজ গড়বে না, জাতির মত জাতি জাগবে না—চারিদিকে দেখা দেবে শুধু মেকীর দল, ফাঁকির দল, ধাপ্পাবাজের দল, চোরাবাজারীর দল এবং রক্তচোষার দল। এই দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধ'রে দেখছি—যে সব দরিদ্র অন্নহীন হয়েও সত্যের ও বিশ্বাসের পণ নিয়ে জীবন চালায়, তাদের তোলবার জন্যে কোন মহাজন তো আসে না। যে সব মাতা নিরন্ন সন্তানের আহার-সংস্থানের জন্য অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ ক'রে মিথ্যাকে সত্যের বজ্রে আহত ক'রে চলে, অভাবের দুরন্ত বেদনার মধ্যেও ঋণের দাসখতে সই দেয় না, ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার জন্যে দিনরাত উপেক্ষিত জীবন যাপন করেন, সেই সব ধাত্রী দেবীর, সেই সব শক্তিময়ী জ্যোতির্ময়ী লক্ষ্মীময়ী দেবীর বেদনার অংশ গ্রহণ করবার জন্যে কজন দাঁড়ায়? বিদ্রোহ হতে পারে, বিপ্লব হতে পারে, ইংরেজদের বিতাড়ন হতে পারে, ইনক্লাব জিন্দাবাদের চীৎকারে আকাশ-বাতাস ফেটে যেতে পারে,—তাতে এক পাও দেশ সামনের দিকে এগোবে না। দেশের স্বাধীনতা তখনই ঘরে ঘরে মূর্ত হবে ম্যানেজারবাবু, যখন

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা হবে কিন্তু নকল হবে না, পাহারাও থাকবে না ; লাইব্রেরির বই সব খোলা থাকবে, ছেলেরা কোন বই চুরিও করবে না, বইয়ের পাতাও নষ্ট করবে না। অন্যায় ক'রে অন্যায় স্বীকার করবে ও নিজেদের শোধরাবে। মহাজনরা মহাযম হয়ে দেশের ও দশের চিত্ত ও বিত্ত লুঠবে না, দোকানদারেরা বা দেনাদারেরা চাওয়ার আগেই পাওনা সব মিটিয়ে দেবে, জাতিতে জাতিতে বজ্জাতি বা ঘৃণা থাকবে না। অস্পৃশ্যতার আবর্জনা আকাশ-বাতাস বিষাক্ত করবে না। যে কোন অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে দল বা সম্প্রদায় থাকবে, কিন্তু দলাদলি বা সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। ধনী সম্প্রদায় জনসাধারণকে বলিষ্ঠ পুষ্ট ও গরিষ্ঠ ক'রে বাঁচাবার জন্যে চোরাবাজার বন্ধ করবে, একচেটিয়া কারবার বন্ধ করবে, লাভবান হয়ে লোভী হবে না, দেশের সর্বনাশ সাধন করবে না। বিদ্রোহী বা বিপ্লবী যে-সে হতে পারে না, যদি হয় তবেই দেশের মৃত্যু, দেশের পতন, স্বাধীনতার কবর। যাঁরা বিদ্রোহ বা বিপ্লব করবেন, তাঁরা রামমোহনের মত, নেতাজীর মত, দেশবন্ধুর মত, মহাত্মার মত, বিবেকানন্দের মত, আশুতোষের মত, বিদ্যাসাগরের মত, বঙ্কিমের মত আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবেন, দেশসেবক হবেন, ত্যাগী ও সংযমী হবেন, এবং অসত্যের ও অন্যায়ের প্রতিকার করবার জন্যে তোষণ ও শোষণ নীতির প্রশ্রয় দেবেন না। যাঁরা নেতার আসন গ্রহণ করবেন, যাঁরা দেশের চালক হবেন, তাঁরা ত্যাগের, সহিষ্ণুতার, নির্লোভের এবং উদারতার মহিমায় জীবনের সমস্ত দিকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস গ্রহণ করবেন। স্বাধীনতার পর বিজাতির প্রশংসায়, চাটুকারিতায় বা পিঠ চাপড়ানিতে যে দেশের চালকগণ দেশের ভাইদের নিকট সম্বলহীন ও অবলম্বনহীন হয়ে পড়েন, সেই দেশের স্বাধীনতায় কোন কাজ হবে না। জীবনের প্রথম থেকে এ পর্যন্ত

চল্লিশ বছর কেটে গেল, স্বদেশপ্রেমিকতার বা স্বদেশসেবার, ধর্ম-প্রবণতার বা সহৃদয় আত্মীয়তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। দৈনন্দিন জীবনের এই যে দুর্নীতি, এই যে লোভ, এই যে আভিজাত্য এবং অভিমান, এই যে নিষ্ক্রিয়তা এবং অলসতায় আমাদের সমস্ত দিক ছেয়ে গেছে, সমস্ত স্তর জুড়ে আছে, এই সবের কি প্রায়শ্চিত্ত হবে না, এই সবের কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না, এই সবের কি বিচার হবে না বলতে চান ম্যানেজারবাবু? পরের ঘাড়ে দোষ দিয়ে, বিজাতির ও বিদেশীর স্কন্ধে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের মনকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছি, আমাদের আত্মদোষকে গোপন ক'রে পরদোষকে বড় ক'রে গলাবাজি ক'রে যাচ্ছি, তার ফল দাঁড়াবে এই—সুদিন হবে আমাদের ভয়ঙ্কর দুর্দিন, আলোতে আমাদের চোখ বন্ধ হয়ে যাবে, সহজ পথ কঠিন হয়ে যাবে, সমস্ত দেশ বা সমাজ ঘুরে মানুষের মত মানুষ, মায়ের মত মা, বোনের মত বোন মিলবে না। স্বাধীনতার মধ্যেই আমাদের দাসত্বের ধূলি "কলঙ্ক-তিলক" এঁকে দেবে। স্বাধীনতা যখন দেখা দেবে, তখন বৈশাখের বহ্নিতাপে ঘর বাড়ি পুড়ে ছারখার হবে, শ্রাবণের জলধারায় খড়কুটোর মত সব ভেসে ভেসেই চলবে, শীতের প্রবল কম্পনে কর্মের জাগরণ আসবে না, গঠন করবার তাপ রক্তপ্রবাহে দেখা দেবে না—জড়তা, অলসতা, অসারতা ও জীর্ণতা সব দিকে দেখা দেবে। আমাদের ইট-পাথরের প্রাচীরে লোনা ধরেছে, আমাদের উন্নতির স্তম্ভেতে ও খুঁটিতে ঘুণ ধরেছে, আমাদের মন্দিরে মসজিদে পূজারী ও কাজীর পরিবর্তে পাণ্ডা ও পাঁজি বেড়ে গিয়েছে। নীতিহীন, সত্যহীন, সংযমহীন বিপ্লবের ও বিদ্রোহের পর যে স্বাধীনতার ইমারৎ গড়ে, তাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজনই পুষ্ট থাকবে আর সব প'চে গ'লে ভিজে পথে ঘাটে

ভেঙে পড়বে। চারদিকে শোনা যাবে ব্যথিতের ক্রন্দন, নিরন্নের হাহাকার, জীর্ণাশীর্ণা জননীর বেদনার কলরোল এবং মত্ত প্রমত্ত যুবক-দলের ক্রিয়াহীন ও নীতিহীন তর্জন গর্জন ও বাক্যাড়ম্বর। সেবা তো সাধকের শক্তি দেবে না, সাধনা তো সবল সত্যকে ধরবে না, কোথাও নিষ্ঠা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয়, আগ্রহ থাকবে না। অধিকারের নামে দেখা দেবে অনধিকার, স্বাধীনতার নামে দেখা দেবে স্বেচ্ছাচারিতা। স্নেহ-ভালবাসার নামে দেখা দেবে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা, ভোগের নামে দেখা দেবে বিলাস ও ব্যসন। সেই স্বাধীনতার চোরাবাজারে সিনেমা-ঘরের আদরই বাড়বে বেশি, খেলোয়াড় দলের খেলাটাই চমক দেবে, যৌবনের মাদকতা, মাতলামি এবং ক্ষিপ্ততাই গড্ডলিকার দল তৈরি করবে, ব্যবসায়ীর ধনের লোভে চালকগণ হবে টাকার গোলাম, অহংকারের ও প্রভুত্বের অর্থহীন তাঁবেদার—তিলে তিলে মরবে সব, বাঁচবে মাত্র কয়েকজন। দেশ কি আর আছে, ম্যানেজারবাবু, আমরা হয়েছি মেষ; দশ কি আর আছে, দশ হয়েছে অবশ্য—ভবিষ্যতের মৃত-অর্ধমৃত; শুষ্ক ভগ্ন জীবিতকঙ্কাল আমার সামনে দেখা দিচ্ছে, আর বর্তমানের ভয়ংকর শাসন ও শোষণটা দশবিকারের ও পঞ্চমকারের মাত্রাটাকে ঘরে ঘরে মূর্ত ক'রে দিচ্ছে। এখন তবে আসি। সময় হ'লে আবার বলব।

একটি কুলি নিয়ে বরাবর জুবিলি স্যানিটারিয়ামে হাজির হলাম। এখানে এসে সবই ভাল লাগল। ম্যানেজার পান্থশালার সব দিকে যেমন নজর রাখেন,—অতিথিদেরও আদর যত্ন সম্ভাষণে ত্রুটি করেন না। একটি ভাল পাঠাগার আছে, গৃহখেলার আয়োজন আছে—বাগানের রেখাপাত সব দিকেই রয়েছে। আমার ঘরে আমি একা নই—কুচবিহার মহারাজের সুযোগপ্রাপ্ত তিনজন শিক্ষার্থীকেও থাকতে

দেওয়া হ'ল। তিনটিই যুবক—একজন আই. এ. প্রথম শ্রেণীর, একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং আর একজন তৃতীয় শ্রেণীর। আমার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি আর তাদের বয়স কুড়ি থেকে চব্বিশের মধ্যে। প্রত্যেকের গায়ে বেশ জোর আছে, জোরে হাসতেও পারে, চীৎকার ক'রে কথাও বলতে পারে। তাদের সকলে ঘরে ঢুকেই কম্বল-চাদরটা ঠিক ক'রে তাস নিয়ে ব'সে গেল—সামনে চা ডিম টোস্ট। চতুর্থ স্থানটি পূরণ করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করা হ'ল। আমার মেয়াদ মাত্র চারদিন—ঘরে ব'সে থাকবার জন্যে আসি নি। ঘরের বাইরে গিয়ে একটু দেখে আসি। একাই বের হয়ে পড়লাম। এই যুবকদের নিয়ে বেড়াব ভেবেছিলাম—শেষকালে সঙ্গীহীন হয়ে একাই আমাকে চলতে হ'ল। তখন প্রায় দশটা। পথের নির্দেশ পেয়ে ম্যালের দিকে চলতে আরম্ভ করলাম। দার্জিলিঙের সবচেয়ে সুন্দর বিশ্রামস্থান এই ম্যাল। এখানে কলের কারবার নেই। ঘুরে ঘুরে এসে পান্থগণ বিশ্রামাসন গ্রহণ করেন। দার্জিলিঙে কিছুক্ষণ পায়ে পথ চলবার পর এখানে পথচারীদের বসতেই হয়, বিশ্রাম নিতেই হয়। দু-তিন মিনিট ব'সে আরাম ক'রে নিয়ে বার্চহিলের দিকে চলেছি, এমন সময় চোখ প'ড়ে গেল একটি বৃত্তরেখার দিকে। পাহাড়ের নীচে এত দূরে এমন চমৎকার সরু রেখায় অঙ্কিত বৃত্ত এল কি ক'রে? একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। প্রকৃতির কাজে আর মানুষের কাজে এমন মিল তো আর সমতলে দেখা যায় নি। ডান দিকে নামবার সিঁড়িতে লেখা রয়েছে—"রংগিত রোড টু লেবং"। একটি অপরিচিত ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নিলাম—ওটা লেবং রেসকোর্স—ম্যাল থেকে প্রায় পাঁচ মাইল। যাবার দুটো রাস্তা আছে। একটা দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া চলে, আর একটা পাহাড়ের

ভিতরের দিকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে যেতে হয়। সেটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ। প্রতি চার রাউণ্ডে হয় এক মাইল। ঘোড়দৌড়ের মাঠটি প্রায় চার মাইল। ম্যাল থেকে এই চার মাইলের মাঠটি সরু রেখাঙ্কিত বৃত্তের মত দেখায়। পাহাড়ের দেশে সবই যেন সুন্দর—চিত্রকরের নিপুণ হস্তের নিদর্শন। লেবঙে যেতেই হবে। পাহাড়ের ভিতরের গলির রাস্তা দিয়ে চলব ভাবছি।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে হেসে বললেন, এই রাস্তা দিয়ে যাবেন ? পথে বিপদ ঘটলে গাড়ি-ঘোড়া আর পাবেন না।

তাতে কি হবে! বাধা বিপদ মানুষেরই থাকে। যে পথ দিয়ে সহজে চলা যায় না, সে পথই আমার। গ্রামের লোক। শত শত মাইল ছেলেবেলা থেকেই একা একা চলেছি।

একা চলা নিরাপদ নয়—জীবন বিপন্ন হতে পারে। আপনার তো সব জানা নেই।

আপদ আছে, আঘাত আছে—তার উপরে যে আর একজন আছেন। তিনিই সব সময় রক্ষা করেছেন এবং করবেন। যখন সব পথ বন্ধ ছিল, তখন তিনি তো পথ দেখিয়েছেন ; যখন লেখাপড়ার কোন উপায়ই ছিল না, তখনই তো তিনিই উপায় ক'রে দিয়েছেন। বাড়ির চারধারে মাতালের ও গাঁজাখোরের নেশায় যখন সব দিকে কোলাহল ও কলরব ছিল, তখন সেই অপরিণত কচি বয়সে সত্যের সহজ পথটি তো সেই তিনিই দেখিয়েছেন। আর সবাই যেখানে মাতাল হয়ে সব হারিয়েছিল, আমাকে সেখানে লেখাপড়ায় মাতাল ক'রে বাঁচিয়েছেন কে ? পেটের দায়ে, ক্ষুধার পীড়নে, সাংসারিক অভাবে অভিযোগে যেখানে মানুষ স্বভাবকে হারায়, দেনার খাতে নাম লিখে সর্বস্ব বিক্রয় করে, জীবনের সমস্ত সাধু ভাব, সাধু কাজ, সাধু পথ, সাধু

মত, সাধু আবেগ এবং সাধু সঙ্গ বলি দেয়, সেথানেও দেখেছি কে যেন পিতাকে গীতাপাঠে মগ্ন রেখেছেন, অভাবের মধ্যেও মনকে স্বভাবসম্পন্ন রেখেছেন, অতিথির মধ্যেও তাঁকে আতিথ্যপূর্ণ ক'রে রেখেছেন। এই সবের মূলে কে? পিতা, না, পুত্র, না, সবার যিনি রক্ষক, ধারক এবং মালিক তিনিই? আমার জীবনে এই ভুলটি হয় নি—সকলের ভুলের মধ্যে মন ভুলিয়ে যিনি তাঁর কাজে আত্মভোলা ক'রে রাখেন তিনিই জীবনের সব পথে আলো দেখিয়ে, অন্তরের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিকট থেকে দূরে, দূর থেকে নিকটে চালিয়ে নেন। তাঁর কৃপায় বিপদই সম্পদ হয়, অপথ বা কুপথও সুপথ হয়, দানব দেবতা হয়, অজ্ঞাত অপরিচিত মানব পরিচিত হন, আত্মীয় হন এবং আপনার হন।

তবে তো মানুষের উদ্যমের বা অধ্যবসায়ের কোন মূল্যই নেই!

নিশ্চয়ই। উদ্যম অধ্যবসায় হবে আমার। বিপদে সম্পদে চলার পথে যেতে হবে আমায়। সুখে দুঃখে সংগীতের আনন্দ নিয়ে, বাঁশীর সুর নিয়ে যেতে হবে আমায়। সবটি পথ পায়ে হাঁটতে হবে আমায়, চারদিক দেখে নিতে হবে আমায়, তবে তিনি চালাবেন, প্রাণে প্রাণ সঞ্চার করবেন। বীর কখনও সংগ্রামের পথে এসে পলায়ন করে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদের সঙ্গে দেহের বাইরে ভেতরে মহাযুদ্ধ তো লেগেই আছে। শীত, সত্য, সন্তোষের রাজ্যমধ্যেও মহাযুদ্ধ চলছে। বীরের যুদ্ধ রয়েছে, সতীর যুদ্ধ রয়েছে, সাধকের ও পর্যটকের যুদ্ধ পথে পথে দিনরাত রয়েছে। যতকাল দেহ আছে, ততকাল সেই যুদ্ধ আছে। সবার উপরে সত্য হচ্ছে, যিনি গর্ভে থাকতেই খবর নিয়েছেন, গর্ভধারিণীর রক্ষার পথ রেখেছেন, বাইরের এই সামান্য চলার পথের বিপদে তিনিই সব খবর নেবেন। তাঁর

পথ ভুলে সব জানতে চেয়েছি ব'লেই সব ভুল বেড়ে যাচ্ছে—সব ব্যর্থ হচ্ছে।

তবে কি ইহকালের সব ছেড়ে পরকালকেই মেনে থাকবেন ?

ইহকালকে বড় ক'রে পেতে হবে, ইহকালেই ভূমার আনন্দ নিতে হবে, ইহকালকেই সমগ্রভাবে সবল ক'রে মুক্ত হতে হবে। ভিক্ষুকের তো মুক্তি নেই, দুর্বলের তো দাবি নেই, আত্মরক্ষা নেই, জীবিত থাকতেই জীবনের আনন্দ, কর্ম থাকতেই কর্মীর স্বাধীনতা এবং মুক্তি। ইহকালহীন দেহত্যাগ হ'লেই মুক্তি লাভ হবে, পরকালের মিলন হবে, সে আশা একেবারে মিথ্যা। এখন যার পথ হবে, রথ চলবে, চাওয়া ও পাওয়া হবে, তখনও তার শক্তি থাকবে, সম্বল থাকবে এবং সাধনা থাকবে। এখানে যারা লুকোচুরি ক'রে দিন কাটায়, সেখানেও তারা দিনরাত পায়চারি ক'রে সময় কাটায়—আসল মালিকের সঙ্গে দেখা হয় না, আসল স্নেহ ভালবাসা প্রীতি প্রেমের পুণ্যপথ ধরা দেয় না; জীবন-সাধনা সোজা নয়, জীবন-রচনাও সোজা নয়, পথে চ'লে সব দেখাশোনা বা জানাও সোজা নয়।

ভদ্রলোক তাঁর বাসার ঠিকানা দিয়ে এবং আমার ঠিকানা নিয়ে সামনের দিকে চললেন। আমার পথ এখন বার্চহিলের পথে। বার্চহিলের পথ ধ'রে ওঠানামা ক'রে দার্জিলিঙের বাইরের ও ভিতরের একটা আভাস পেলাম। যত ইংরেজ ছেলেমেয়ে মহিলা দেখলাম, তাদের মধ্যে ইংরেজী ছাপ আছে। বাংলা দেশের পীঠস্থানে পাহাড়িয়াদের সঙ্গে থেকে তারা তাদের নিজস্ব সম্পদ হারায় নি, নিজস্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলি দেয় নি, ওঠাতে নামাতে চলাতে বলাতে তারা যে আমাদের হয় নি, আমাদের দেশকে ভালভাবে চেনে নি

বা বোঝে নি, কিন্তু আমাদের চালাকি, ফাঁকিবাজি, শঠতা, ধূর্ততা বা সঙ্কীর্ণতা বেশ ক'রে চিনে আমাদের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার করতে শিখেছে, তা আলাপ ক'রে, গির্জায় গিয়ে বেশ টের পেলাম। প্রকৃতির খোলা জায়গায় এনে ছেলেমেয়েগুলিকে এমনভাবে হাঁটায় বা চালায়, যাতে তাদের দেহদুর্গ সবল হয়ে সুদৃঢ় হয়ে গ'ড়ে ওঠে। শীতের মধ্যে ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে, খেলা করছে, নেচে নেচে বেড়াচ্ছে—মনে হচ্ছে, এদের ছেলেমেয়েরা প্রকৃতি থেকে আসল জিনিস নিতেও জানে, রাখতেও জানে—বেড়াবার সময় বা খেলার সময় তারা 'ফুলবাবু' সাজে না, কোমল ফুলের মত এত মৃদুভঙ্গুর হয় না। তারা যুদ্ধ ক'রেই বাঁচতে চায়, যোগ্যতা দিয়েই গ্রহণ করতে চায়, অধিকারী হয়েই অধিকার পেতে চায়। ইহকালকে এরা ছেলেবেলা থেকেই ফাঁকি দেয় না। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের সেই সব প্রকৃতির কোলে স্থান নেই, কারণ স্থান লাভ করবার শক্তি তারা অর্জনই করে না। বাঙালী বাবুরা শুধু মরাকে মারতে জানে, দুর্বলকে সায়েস্তা করতে জানে, ঝি-চাকরদের শাসাতে জানে, ছেলেমেয়েদের কোমল ক'রে একেবারে অচল পঙ্গু করতে জানে। আমাদের ধনীর সন্তান হয় অকেজো অপদার্থ আদুরে আর গরিবদের সন্তান হয় লাঞ্ছিত অনাদৃত উপেক্ষিত। উভয়েই প্রকৃতির কৃপাপাত্র বা করুণার পাত্র হয়ে পথের কণ্টক হয়ে দাঁড়াবে।

মনে মনে নিরাশ হয়ে গেলাম। এত হাঁটলাম, এত সব ইংরেজ ছেলেমেয়ের সাহসের ও বীরত্বের কাহিনী পড়লাম, দার্জিলিঙের নিজস্ব বা বাঙালীর নিজস্ব কোন সাহসী ছেলের চিহ্ন পাব না? নিজের লজ্জায় নিজের মাথা নত হয়ে গেল, মন একটু

অবসন্ন হয়ে পড়ল। পাহাড়ের দেশে একটি ঘটনার মত ঘটনার পরিচয় যদি মেলে !

হঠাৎ চোখে পড়ল—Died 23rd June, 1900 (১৯০০ সালের ২৩এ জুন মারা গিয়াছে)। কৌতূহল বেড়ে গেল। এ আবার কোন্ শহীদ! এ দেশেতে বড় বড় নামজাদা বীরদের ছাইভস্মে পর্যন্ত মাহাত্ম্য থাকে, মাহাত্ম্য আবার তীর্থে তীর্থে নীড়ে নীড়ে প্রচার করা হয়, তার ব্যাখ্যা করা হয় ; কিন্তু অখ্যাত বীরদের নামে কোন লেখা থাকে কি ?

মুগ্ধ হলাম, প্রণাম করলাম যখন চোখে আবার পড়ল—Erected to the memory of Jun who saved a forest officer. Aged 9 years. (নয় বছরের একটি ছেলের স্মৃতিরক্ষার্থে এই স্মারকলিপি সংরক্ষিত। একজন ফরেস্ট অফিসারের জীবন এর জীবন দিয়ে রক্ষিত।) মনে মনে গর্ব হ'ল যে, একটি সামান্য ছেলে এমন অসামান্য সাহস দেখিয়ে আর একটি জীবন রক্ষা করেছে। সময় সুযোগ পেলে আমাদের ছেলেরা সম্ভবকে অসম্ভব্—অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে ফেলতে পারে। এদের সবই আছে, নেই তাদের চালক, নেই তাদের পথপ্রদর্শক—আদর্শ নেতার অভাবেই তাদের উদ্দেশ্য উপায় দুই-ই নষ্ট হয়। দোষ সব আমাদের, তাদের দিকে তো আমরা চাই নি।

এই বীরত্বকে প্রণাম জানালাম। নয় বছরের শহীদকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নীরবে দেখালাম। এই কয়টি অক্ষরে অন্তরের স্বাক্ষর আছে, আন্তরিকতার উপহার আছে। প্রচারের কোনও বালাই নেই, প্রমাণের কোনও আদেশ নেই। মৃত্যুর মধ্যেই এর পবিত্র জীবন পরীক্ষিত। যার প্রাণ নেই, সে তো প্রাণ দিতে পারে না।

মনে হ'ল, "যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই, যে মৃত্যুকে জয় করে, ভোগ করা তাহাকেই সাজে।...মৃত্যুর আহ্বানমাত্রে যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির-আদৃত মুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকেই চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে, পৃথিবীর সুখসম্পদ তাহাদেরই। যাহারা জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহাদের আনন্দ মুক্তির।"—'বিচিত্র প্রবন্ধ'

বিশ্বকবির অমৃত অক্ষরে এই নয় বছরের ছেলের মৃত্যু নবজীবন লাভ করুক। যে সব ছেলে কেবল ব'কে যায়, চাল দিয়ে চলে কিন্তু লড়াই করে না, বীর্যের সঙ্গে বলতে পারে না—দেহ চাই, মন চাই, প্রাণ চাই, চাই স্বাস্থ্য, চাই আলো, অথবা মিথ্যার জীবন চাই না, বিলাসের যৌবন চাই না, সস্তা সুখ চাই না, তারা এই ছেলের জীবন থেকে জীবন লাভ করুক,—বাঁচাতেই জীবন নয়, বাঁচানোতেই জীবন।

নগরে ও পাহাড়ে সামাজিক জীবন সে ভাবে গড়ে না। বার্চহিলের পথে বহুদিনের পরিচিত কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল, আলাপ হ'ল, গলাগলি হ'ল, আলিঙ্গনও হ'ল; কিন্তু মনের, হৃদয়ের বা অন্তরের যোগাযোগ নিয়ে নয়। আমাদের সমাজে ও অন্য সমাজে অনেক প্রভেদ। আমাদের সমাজে সব সময় গরমিল থাকে, অভিমান ও অহিংসা থাকে, পদের ও অর্থের মাপকাঠি নিয়ে আদর সমাদর হয়ে থাকে, আবার জাতির উচ্চতা নীচতা অনুসারে বিভেদের ব্যবধান থাকে। ব্রাহ্মণের মধ্যেই শত শত বিভাগ, অব্রাহ্মণের মধ্যে হাজার হাজার বিভাগ—অচলে অচলে, চলে অচলে

বিভাগের শেষ নেই। অর্থের প্রাচুর্য থাকলে অনেকটা অভাব পূরণ ক'রে নেওয়া চলে অর্থের অল্পতা থাকলে, পদের সামান্যতা থাকলে সব দিকেই গরমিল চলে—ছাত্র শিক্ষক, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন করুণার চোখে সব সময় দেখে জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তোলেন। বার্চ-হিলের চারধারে এতদিন পরে বাঙালী প্রতিবেশীর অসামাজিকত্বের গভীর পরিচয় পেলাম। কে বলে, বিদেশে বাঙালীর মত আপন জন নেই, আত্মীয় নেই? বাঙালী চিরকালই স্বার্থপর, অভিমানে অহংকারে নিন্দায় ছলনায় ভয়ঙ্কর। বাঙালী মুসলমানের গোমাংস খেয়ে, খ্রীষ্টানের ডিসে মশগুল হয়ে তার অচল ভাইয়ের পূজার প্রসাদও গ্রহণ করে না, বাঙালী পরকে শত্রুকে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে এনে জায়গা দিয়েছে, তোয়াজ করেছে, কিন্তু নিজের আপন ভাইকে বাস্তুহারা ভিটেছাড়া করেছে, বাঙালীর নিজের ঘরের লোক চোখের সামনে মুসলমান হয়েছে, খ্রীষ্টান হয়েছে, জাত্যাভিমানে, জাত্যহঙ্কারে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নি, হোটেলে, হোস্টেলে, মিষ্টির ঘরে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, উৎসবে, পার্বণে নিজের অর্থহীন জাতিহীন শিক্ষাহীন ভাইদের নির্যাতন করেছে, অপমান করেছে, অন্তরের মধ্যে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বালিয়েছে। নিজের চোখের সামনে দেখেছি সাহেবী খানা খেয়ে এসে বা বাবুর্চির হাতে খেয়ে এসেই দশ টাকা মাইনের উচ্চজাতের এক কেরানী বা কুড়ি টাকার কলের চাকর অনুচ্চজাতের প্রতিবেশীকে পদে পদে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছে। বিদেশেও ঐ ভাবটা প্রবলভাবে দেখা না দিলেও প্রচ্ছন্নভাবে বেশ দেখা দিচ্ছে। এ বিষয়ে মুসলমানজাতি আমাদের নমস্য। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কি ঘরে, কি বাইরে, তাদের আন্তরিকতার বা আতিথেয়তার পরিচয় সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। ওস্তাদের সম্মান, সর্দারের সম্মান, চালকের সম্মান এরা দিতে জানে।

তারা যা করে, এক অভিন্ন হয়েই করে—তাদের উৎসবে আর আমাদের উৎসবে অনেক তফাত। আমাদের উৎসবে বিচারের ও বিভাগের অন্ত নেই, আচারের অত্যাচারের তলও নেই, পারও নেই। এই চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার ফল এই দাঁড়িয়েছে—হিন্দুতে হিন্দুতে বাইরের একটা আপোস-মীমাংসা হয়; কিন্তু প্রাণের মিল, হৃদয়ের মিল একেবারেই হয় না। এত জাতিবিভাগ, এত শ্রেণীবিভাগ, এত পদবিভাগ, এত ধর্মবিভাগ, এত মন্দিরবিভাগ যে, এক হয়ে চলার, এক হয়ে ভাববার, এক হয়ে দাঁড়াবার কথাই ওঠে না। যে সর্বজনীন পূজার আয়োজনে পাতাল ভেদ ক'রে নাগিনী ডাকিনী পর্যন্ত নেচে নেচে আসে, সেই পূজাতে সর্বমঙ্গলার আহ্বান—আরতি হয় না, সর্বনাশিনীকেই সমাদরে আপ্যায়িত করা হয়। যখন সর্বজনীন পূজা অচলজাতির শাস্ত্রজ্ঞ লোক করতে পারবেন এবং চলজাতির লোক হাসিমুখে তাঁর কাছ থেকে অঞ্জলি নিয়ে পূজার প্রসাদ গ্রহণ করবে, তখন সর্বজনীন পূজা সার্থক হবে। প্রবাসেও দেখেছি আমাদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এত পার্থক্য থাকবার বড় কারণ—আমাদের মধ্যে সামাজিক ভাবে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের প্রচলন নেই, তাতেই সমাজ আরও মরেছে, আচারের অত্যাচার চরমে উঠেছে এত যে বিপ্লব বা বিদ্রোহ দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে যৌতুকপ্রথা তুলে দেবার, অচলকে চল করবার, পতিতকে জীবিত করবার কোন তুমুল আন্দোলন সেই ভাবে তো আরম্ভ হয় নি। আমাদের দোষেই আমরা তলিয়ে যাচ্ছি, এবং অপাঙ্‌ক্তেয় হচ্ছি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা, বিবেকানন্দের কথা, মহাত্মার কথা, বিশ্বকবির কথা, চৈতন্যদেবের কথা ও কবির-নানকের কথা আমরা তো শুনি নি, সেই আদর্শে কোন কাজই করি নি—প্রায়শ্চিত্ত আমরা করব না তো করবে

অন্তে? যাদের গ্রহণ আছে বর্জন নেই, যোগ আছে বিয়োগ নেই, পূরণ আছে ভাগ নেই, প্রতিমা নেই গরিমা নেই, অথচ সতীমার গৌরব আছে, অধিকার আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথাটি তখন সঙ্গীহীন স্মৃতিবিহীন বন্ধুর পথে অবিকল সত্যরূপে দেখা দিল।

"সামাজিক অত্যাচার হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মনীতির ধ্রুব অনুশাসনগুলি পর্যন্ত সকলেরই প্রতি সমান কড়াকড় করাতে ফল হইয়াছে, আমাদের দেশের সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় ও কঠিন হইয়াছে কিন্তু ধর্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে।

"একজন লোক গরু মারিলে সমাজের নিকট নির্যাতন সহ্য করিবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিবে, কিন্তু মানুষ খুন করিয়া সমাজের মধ্যে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্থান পাইয়াছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমি যদি অস্পৃশ্য নীচজাতিকে স্পর্শ করি, তবে সমাজ তৎক্ষণাৎ আমাকে সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু আমি যদি উৎপীড়ন করিয়া সেই নীচজাতির ভিটামাটি উচ্ছন্ন করিয়া দিই, তবে কি সমাজ আমার নিকট হইতে সেই কাহনের হিসাব তলব করেন? প্রতিদিন রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, মিথ্যাচরণে ধর্মনীতির ভিত্তিমূল জীর্ণ করিতেছি, অথচ স্নান, তপ, বিধিব্যবস্থার তিলমাত্র ত্রুটি হইতেছে না।" স্বাধীনতা লাভের পরও কি এই সব কলঙ্ক মুছবে?—অসম্ভব। বার্চহিলের পাথরগুলোরও সংস্কার আছে, পরিবর্তন আছে, প্রাণের বিনিময় আছে, যোগাযোগ আছে, কিন্তু আমাদের যেন কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন নেই। যে সব পরিবর্তন দেখছি, সে সব দেহের উপর রঙ-করা আস্তরণ মাত্র, তাতে অন্তরের গভীরতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, যাবেও না। বেলা প্রায় বারোটার সময় স্যানিটারিয়ামে ফিরেছিলাম। তিনটি ছাত্রবন্ধু

তখনও তাসখেলা নিয়ে একেবারে মাতাল। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার নাওয়া-খাওয়া শেষ ক'রে নিলাম। এখানে পাহাড়ের দেশে নূতন আবহাওয়ায় এসে সময় বেশি নিতে বাধ্য হলাম। পনর মিনিটের বেশি কিছুতেই লাগাতাম না। বিশ্রামের সময় মনে হ'ল— এরা কি শুধু পাহাড় আর পাথর? এরা কি সব মূক বধির? এদের কি জীবন নেই? এদের কি ভাব নেই? এরা কি দেশের সম্পদ নয়? উত্তর এল পাথরের দেশ থেকে—সমতলভূমির মেরুদণ্ড ও মানদণ্ড এরাই। এদের বুক চিরে যে জলধারা ভগীরথের গঙ্গার ধারার মত নেমে আসে, তাতেই স্রোতস্বতী তৈরি হয়, তাতেই আঘাত লেগে বারিবর্ষণ হয়, তাতেই আঘাত লেগে সোনার মাটি তৈরি হয়। সমতলের ধূলিকণা বা নরম মাটির অণুপরমাণুর পিতৃপিতামহের অতীত বংশধারা যে এই সব পাহাড়ে পর্বতে। প্রত্যেকটি দিনের প্রত্যেকটি মুহূর্তই সৃষ্টির মধ্যে বিরাট ধ্বংস এবং ধ্বংসের মধ্যে বিরাট সৃষ্টি রচনা ক'রে যাচ্ছে। এ তো শুধু বার্চহিলের দৃশ্যই অবসর সময় ভেসে আসে না, নূতন পুরাতনকেই রূপ দেয় এবং ভবিষ্যৎকে রূপায়িত করবার আয়োজন করে। পুরাতনকে বাদ দিয়ে তো নূতন হয় না, নূতনের মধ্যে আবার উভয়ের সম্পূর্ণতা। নূতন যখন পুরাতনকে বাদ দিয়ে বাঁচতে চায়, তখন সে তো মরেই, সবাইকেই মারে। নূতনের মধ্যে যা ব্যাপ্ত, তাই হয় সংক্ষিপ্ত। বৃহৎ ক্ষুদ্রকে নিয়েই নূতন সব গড়ছে।

তিন ছাত্রবন্ধুর তাসখেলার মাতলামি দেখে শুধু অবাকই হই নি, এই তিনকে উপলক্ষ্য ক'রে আমাদের দেশের যুবক-সমাজের ভবিষ্যৎহীন ভবিষ্যতের বিষয় ভাবতে লাগলাম। বেলা যখন তিনটে হয়ে গেল, তখন তাঁদের ভালভাবে বললাম—আপনাদের দার্জিলিং ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি এই? কুচবিহারের রাজার দয়ার সুযোগ তাস খেলেই নেবেন?

কয়েক মিনিট তিন জন চুপ ক'রে থেকে আবার ব'সে গেল, মেতে গেল এবং ডুবে গেল।

এরা স্বাধীনতার অর্থ বুঝেছে ভাল। পরকে ঠকিয়ে, পরের চোখে ধুলো দিয়ে সমস্ত সুযোগ নেবে। তারপর তাসপাশা খেলে, ভ্যাগাবণ্ডের মত ঘুরে ঘুরে অলসভাবে খাবে দাবে, চলবে হাসবে এবং মেতে থাকবে। ওরা কারও অধীন থাকবে না—কখনও গাছের তলে, কখনও মাঠের বুকে, কখনও পান্থশালার বিরামভবনে, কখনও দয়াবানের কুটীরে স্থান ক'রে নেবে—এদের জীবন-তরণী কোনও হালের অধীন থাকবে না। অসীম জগৎসমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গে তরঙ্গে তারা দশ দিকে ঘুরবে। এদের স্বাধীনতার অর্থ একেবারে বন্ধনমুক্তি, অর্থাৎ মুক্তির নামে সব দিকেই উদ্বন্ধন। যুবকদের বিশেষভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, স্বাধীনতার অর্থ স্বাধিকার—নিজেকে সব দিক দিয়ে অধিকার করা। যুবকগণ অলসতা ও বিলাসিতা ত্যাগ ক'রে শক্তির সাধক হবে, সত্যের সেবক হবে এবং কর্মের উপাসক হবে। ভ্রমণে এসে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে পেচকের মত থাকবে কেন? ভ্রম-সংশোধনের জন্য যে তৈরি করা মন, তাই তো প্রকৃত ভ্রমণ। দেখবার আকাঙ্ক্ষা থাকবে অসীম, জানবার কৌতূহল হবে অসীম, লেখাপড়ার ব্যাকুলতা হবে অসীম, দেহমনে আয়োজন করবার ব্যবস্থা থাকবে প্রচুর। প্রাচুর্যকে উপেক্ষা ক'রে যুবকগণ সব দিক দিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়বে, অবসাদ থেকে তাদের আগ্রহ ও উৎসাহ একেবারে লোপ পাবে, তারাই শেষকালে জাতির মেরুদণ্ড বা মানদণ্ড না হয়ে হবে জাতির বংশদণ্ড ও ধ্বংসদণ্ড। তারাই দেশের ও সমাজের দিক্‌পাল না হয়ে হবে দেশের মহাকাল। জরা এবং জড়তা তাদের অকালে এমন পেয়ে বসবে যে, তারাই তাদের সবচেয়ে বড় বন্ধন হয়ে থাকবে।

বের হয়ে পড়লাম আবার নূতনকে নূতন ক'রে দেখবার জন্যে, পুরাতনকে জানবার জন্যে। হেঁটে হেঁটে চলতে খুব ভাল লাগে, কারণ এখানে তত জোরে হাঁটা যায় না। এখানে সমতল দেশের ডাঙা মাঠ নেই, শুষ্ক নদীর বালুকারেখা দেখা যায় না, আকাশের নীল মেঘ খেলা করতে এসে পৃথিবীতে ধরা দেয় না, এখানে ফলের গাছগুলি এবং বাঁশগাছগুলি সরু বক্র হয়ে আলো-জল-বায়ুর সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করতে যেন অক্ষম। এখানে মহিষের ঘাড়ে লাঙল জোড়া থাকে না, এখানে মাঠে মাঠে সোনালী ধানও ফলে না আর বর্ষার স্রোতে কই-মাগুরও উজানে চলে না, এখানে পদ্মার ও মেঘনার সুন্দর ভয়ঙ্কর দৃশ্যও মেলে না, শরতের শান্ত জ্যোৎস্নায় বিজয়ার পরে নদী শীতলপাটির মত শয়ান থাকে না, আবার কালবৈশাখীর প্রলয় ঝড় বা প্রলয় তুফান নদীর ঢেউয়ের মাথাগুলি সাপের ফণার মত ফাটিয়ে দেয় না—অন্ধকারের ঘন কালোর মধ্যে উজ্জল সুন্দর ভয়ঙ্কর রূপবৈচিত্র্য নেই। ভিলা বা বাংলোর আশেপাশে সবুজ ঘাসের চিহ্ন মেলে না। এখানে সকল দেশের চাইতে শ্যামল তরুলতা মেলে, কিন্তু কোমল দূর্বাদল মেলে না। এখানে নদীর পথ জীর্ণ শীর্ণ ও সংকীর্ণ, তর্জন গর্জন ভয়ঙ্কর, পৃথিবীর কঙ্কালের মত বড় বড় কালো পাথর নদীর বুকের উপর প'ড়ে থাকে। মাঝে মাঝে সেই চাপা পাথর সরাবার জন্যে অবিশ্রান্ত লড়াই হয়। পাথর ব'সে থেকে মোড়লের মত বলছে, এবার নড়াও দেখি! নদী তার প্রত্যুত্তর দেবার জন্য কখনও আছাড় দিচ্ছে অন্য পাথর দিয়ে, কখনও বা আছড়ে পড়ছে, আর কখনও বা বর্ষার ধারার বেগে পাথরকে শাসাচ্ছে, ধমকাচ্ছে এবং সমস্ত আক্রোশ ঢালছে। এতে পাথরের যেন কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। গাছের তলায় টাট্টু ঘোড়া বাঁধা থাকে না, গাছের গুঁড়িতে কোন বলদ বা মহিষ গা

চুলকতে আসে না, লম্বা দড়িতে বাঁধা কোন ছাগলকে ঘাস খেতে দেখা যায় না। সমতলের ফলফুলের বাগানের মত বাগান এ দেশে মেলে না। এখানে লম্বা লম্বা সরু সরু শালগাছ বা অশ্বত্থগাছ ও পাথরের গড়া একটানা প্রাচীর বা রাস্তা দেখা যায়। মস্ত মস্ত পাথরের ফাটলে ক্ষুধিত খিন্ন গাছের শিকড়, ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়ী জঙ্গল, সাপ-শিয়ালের তত উপদ্রব নেই, তবে মাঝে মাঝে বাঘ এসে রাজপথ থেকে গোধূলির ম্লান অন্ধকারে দু-একজন পথিককে অবহেলায় নিয়ে যায়। সমতল ও শিলাতলে মিলন দেখবার জন্যে কে না বাইরে ছুটে যায়!

"সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি
হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।
তুচ্ছতার বেড়া হতে মুক্তি তারে কে দিয়েছে আনি
প্রত্যহের ছিঁড়েছে বন্ধন।"

দার্জিলিঙের জাদুঘর

পৃথিবীর আলোয় ছায়ায় রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে মানুষের ভিতরটি ছড়িয়ে আছে। অমাবস্যার গভীর আঁধারকে যেমন মানুষের হৃদয় গ্রহণ করে, আবার পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্নার অম্লান হাসিটুকুও সে প্রাণ ভ'রে গ্রহণ করে। যিনি ভ্রমণ করতে গিয়ে সুখ-দুঃখকে, আলো-ছায়াকে একই ভাবে গ্রহণ করেন, তিনি অনেক জঞ্জাল থেকে বেঁচে যান। চলার পথে সমস্যা আসে খুব কম। অতিরিক্ত মাত্রায় গণনা ক'রে, চিন্তা ক'রে, সূক্ষ্ম বিচার ক'রে মানুষের জীবন চলে না। যোগ অঙ্কের ফলের মত মানুষের কর্মফল এত সহজশুদ্ধ

হয় না। মনের রঙ নিয়ে, ভিতরের সুর নিয়ে সে বাইরের শুষ্ক সত্যকে চিন্ময় ক'রে তোলে, সরস ও সুন্দর রাখে। চলতে চলতে দার্জিলিঙের জাদুঘরে উপস্থিত হয়ে পড়লাম। জীবন্ত বাঘ সিংহ জিরাফ গণ্ডার হিপোপটেমাস ইত্যাদি দেখে মানুষের মনে যে আনন্দ হয়, জাদুঘরের সুরক্ষিত মৃত জীবের অস্থিকঙ্কাল দেখেও সে আনন্দ কমে না. তৃপ্তি কমে না। প্রথমেই চোখে পড়ল "দি গ্রীন্ পেট ভাইপার" ও "দি মালয়ান হুইপ স্নেক"। কি ভয়ঙ্কর তাদের দৃশ্য, কি বিচিত্র তাদের দেহ! ক্রূর খলের মতই ভয়ঙ্কর ক্রূর এরা। "দি টিবেটান লিংক্স," "দি ইণ্ডিয়ান শ্লথ বিয়ার," "দি রেড কেট বিয়ার," "সিকিম হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার"—মানুষের রুচির কথা মনে করিয়ে দেয়। মিউজিয়মকে আকর্ষণযোগ্য করবার জন্যে মানুষ যে প্রাণ থেকে কত আয়োজন করে, তার পরিচয় এখানে। এই সব জাদুঘর তো জাদুকরের ঘর নয় যে, মিথ্যাকে সত্যে পরিণত ক'রে সব দেখানো যায়। এই সব জাদুঘর শিক্ষার বৃহৎ ঘর—চারিদিক থেকে ছেলে মেয়েরা, যুবক বৃদ্ধেরা এসে সত্য জিনিসকেই দেখে জেনে প্রকৃতির জাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হবে। এখান থেকে এই সব রক্ষিত মৃত জীব দর্শককে আহ্বান করছে—আয় রে, তোরা আমাদের ভাল ক'রে জেনে নে, দেখে নে, চিনে নে। আমাদের জানলেই তোদের চোখ খুলবে, মনের তিমির-দুয়ার ভেঙে যাবে। আমরা মৃত বটে, কিন্তু কত 'মরা মন' আমাদের দেখে বেঁচে ওঠে, কত 'অবোধ শিশু' আমাদের দেখে প্রকৃতির 'অজানা স্বরলিপি' ভাল ক'রে বুঝে নেয়।

"We live to die and die to live"—জীবন্মৃত্যুর বড় সত্যের পরিচয় এইখানেও। এখানে জাদুঘরের অন্তরে-বাহিরে সম্পূর্ণ যোগাযোগ আছে। পাহাড়ের দেশে বাইরের ভিতরের অবিচ্ছিন্ন

যোগাযোগটাই সব দিকে দেখা যায়, ঘরগুলিতে নয়—মনগুলিতে, হৃদয়গুলিতে। এই গৃহ যেন মানুষের নাড়ীর বন্ধন ছেদন করে নি। 'বার্হেডেড গুজ,' 'দি ইস্টার্ন প্যাংগোলিন,' 'দি মালয়ান পাম কি-ভেট,' 'দি গ্রীন ম্যাগ্‌পাই,' 'দি ইস্টার্ন পাম সুইফ্‌ট' প্রকৃতির রাজ্যের অপূর্ব সম্পদ। মানুষের হাতে ধরা দিয়ে তারা জীবন মৃত্যু দুইকেই বাঁচিয়ে রেখেছে। মৃত্যু যে ভয়ানক, তা তো এখানে বোঝা যায় না। এখানে মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের মনের গতি রয়েছে, বদ্ধ মৃত্যুর হাত ধ'রে মানুষ মৃতের জীবনকে দেখতে পাচ্ছে, কাজেই এই রুদ্ধ ঘরের গবাক্ষ ভেদ ক'রে জীবন্ত মানুষের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি মিশে যাচ্ছে—'এখানে জীবন যেমন আসে জীবন তেমনই যায়; মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনই যায়'। ফিরে ফিরে অনন্ত জীবন-স্রোত মৃত্যুকে জানবার জন্যে আসে, যায়। তারপর হিন্দুস্থানী 'গৌরী গাই,' জে. ম্যাকফার্সন সাহেবের 'দি সম্বর,' এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রাপ্ত 'একশিং গণ্ডার'। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। অসংখ্য প্রদীপে জ্বালা বিশ্বমন্দির থেকে আরতির ঘণ্টা বেজে গেল। আহ্বান এল—

"বিন্দু দুই অশ্রুজলে
দাও উপহার অসীমের পদতলে
জীবনের স্মৃতি।"

আজকে ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যার উপহার নিয়ে স্যানাটোরিয়ামের ভিতরে পা বাড়িয়েই মনে হ'ল, পাহাড়ের দেশে রাত্রিতে বাইরে থাকা চলে না, কারণ এক দিকে শীত অন্য দিকে কুয়াসা, তার মধ্যে জনহীন পথ এবং পথহীন ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি। এখন তবে তো বিশ্রাম! আমি জানি, কর্মদীন বা কর্মহীন বিশ্রামের ঘরই মৃত্যুর ঘর। মানুষের বর বা দেবতার বর সেই নির্লিপ্ত বিশ্রামে একেবারেই মেলে না।

"হে ভুবন,
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।"

জুবিলি লাইব্রেরি

পাহাড়-পর্বতের নিঃশব্দ শব্দকে, মানুষ তার সীমাহীন শব্দ-তরঙ্গের কল্লোলকে কেমন ক'রে বেঁধেছে, তা জানবার কৌতূহল হ'ল। লাইব্রেরির মধ্যে এত মানব-হৃদয়ের বন্যা বাঁধা রয়েছে! এবার সেই ডাক এল। গর্কির 'মাদার' ও রোঁমা রোলার 'বিবেকানন্দ' খুব আগ্রহের সহিত নিয়ে এলাম। যে দুটি জিনিসের অভাবে সারাজীবন পড়ার ব্যাঘাত জন্মেছিল, তার অভাব এখানে হয় নি। পেয়েছি বৈদ্যুতিক আলো, পেয়েছি সাংসারিক অনর্থ কাজের অর্থহীন ভিড়।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে রোঁমা রোলার 'বিবেকানন্দ' পড়তে আরম্ভ করলাম। ফরাসী দেশের একজন মনীষী আমাদের অধীন দেশের একজন অগ্নিমন্ত্রের সাধক এবং বিশ্বমুক্তির পুরোহিতকে কেমন ভাবে চিনেছেন, বুঝেছেন এবং শ্রদ্ধা করেছেন, তা বিশেষভাবে জানবার কৌতূহল হ'ল। প্রত্যেকটি পাতাতে ভারতীয় সাধক-চরিত্রের গৌরব বাড়িয়ে বিশ্বের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। মহাসাগর ও মহাদেশ পার

হয়ে মনীষী লেখকের মন স্বামীজীর যে সব সত্যকে গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন, সেইগুলি তাঁর মননশক্তির, গ্রহণশক্তির এবং ধারণশক্তির প্রমাণ দিচ্ছে। কত বড় প্রেমিক এই ফরাসী প্রেমিকটি, যাঁর প্রেম সমস্ত সমাজ, সমস্ত কাল অতিক্রম ক'রে বিশ্বহৃদয় স্পর্শ করেছে।

গ্রন্থের প্রস্তাবনায় চতুর্থ পৃষ্ঠাতে স্বামীজীর উক্তিকে উদ্ধৃত ক'রে তাঁর নির্বাচনশক্তির সার্থকতা দেখিয়েছেন।—

"Above all be strong and manly! I have a respect even for one who is wicked so long as he is manly and strong. for his strength will make him some day give up his wickedness or even give up all works for selfish ends and will then eventually bring him into the truth."

"সবার উপরে বলিষ্ঠ ও মনুষ্যত্বসম্পন্ন হও! বলশালিতা ও মনুষ্যত্ব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ কাহারও মধ্যে দুষ্টামি থাকা সত্ত্বেও আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি ; কারণ তাহার শক্তি তাহাকে একদিন না একদিন শয়তানি এবং স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল সমস্ত কার্য ত্যাগ করার জন্য প্রেরণা দিবেই। পরিণামে তাহাকে সত্যের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবেই।" বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মনীষী রোঁমা রোলার প্রত্যেকটি লাইন ভ্রমণের নূতন দর্শন আবিষ্কার করছে। কোথায় ফরাসী দেশের মনীষী, কোথায় অদ্বিতীয় বিশ্বপ্রেমিক বীরসাধক বিবেকানন্দ, আর কোথায় দার্জিলিং পাহাড়ে একটি পান্থশালার পান্থ আমি। কোথায় সেই সেবক, যিনি আর্তপীড়িতদের ব্যথায় "মাই কান্ট্রি, মাই কান্ট্রি" ব'লে শিশুর মত অসহায়ভাবে কেঁদেছিলেন, এবং দরিদ্র ভারতকে, নিরন্ন ভারতকে পদানত ভারতকে, স্বার্থমগ্ন ভারতকে, লুব্ধ ভারতকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করবার জন্য আমরণ সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন? পড়ছি

আর মনে হচ্ছে, কোথায় সেই বিশ্বসত্যের পূজারী বিবেকানন্দ, যাঁর পুণ্যচরিত্র গঙ্গায় মিশে নির্মল ও মলিন স্রোতোধারার মত জন-স্রোতকেও নির্মল ও পবিত্র ক'রে দিয়েছে? আত্মমর্যাদাহীন বাংলার দিকে এবং পরপদলেহনকারী ভারতের দিকে লক্ষ্য ক'রে এই গ্রন্থটির অক্ষরে অক্ষরে স্বাক্ষরিত রয়েছে, কোথায় সেই বিবেকানন্দ, যিনি শিকাগোর ধর্মসভায় প্রমাণ করেছেন,—ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হ'লে এবং ধর্মের উদারতা ও সর্বজনীনতা থাকলে, খ্রীষ্টান খ্রীষ্টান থেকেই, হিন্দু হিন্দু থেকেই, মুসলমান মুসলমান থেকেই অনন্ত বিস্তৃত আলো-হাওয়া জলের মত সবাইকে বাঁচাবে, গ'ড়ে তুলবে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত করবে? কোথায় সেই যুবক বিবেকানন্দ, যিনি কুসংস্কারকে পদদলিত ক'রে পুরোহিত শ্রেণীর জঘন্য ব্যভিচারকে, অত্যাচারকে নির্মূল করবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, মানুষের মধ্যে যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য, মহম্মদ, বুদ্ধ মূর্ত করেছিলেন? সামান্য কয়েকটি দিনে বিশ্বে যুগান্তর এনেছিলেন? কোথায় সেই বাংলার বিবেক, আমাদের ঘরের বিবেক, যিনি অনবদ্য চরিত্রের গুণে রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে দূরে থেকেও ভারতের অদ্বিতীয় রাজনীতিবিৎ, বাঙালী হয়েও অদ্বিতীয় দেশপ্রেমিক, ইন্দ্রিয়জগতে থেকেও অদ্বিতীয় ইন্দ্রজয়ী যুবক? তিনি আমাদেরই ঘরের বিবেক। সব স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে না কি? কিন্তু স্বপ্ন তো নয়! আমাদের ছেলেমেয়েরা রাজনীতি, সমাজনীতি, সাম্যনীতি বাদ দিয়ে যদি বাংলার বিবেকানন্দকে চরিত্রের সম্পদ করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করত, তবে আর আমাদের ভাবনা থাকত কোথায়? প্রভু ইংরেজরাও মাথা নত ক'রে শ্রদ্ধা করত এবং সমস্ত অধিকার দিতে বাধ্য হ'ত। ধনতান্ত্রিক মার্কিন জাতিও গণতান্ত্রিকতার গুরুদেবদের তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেবা করবার জন্যে প্রস্তুত হ'ত। কোথায় সেই অপূর্ব গুরু-শিষ্য-বন্ধন!

দুইজনই দুজনকে চিনে একেবারে চিন্ময় ও তন্ময় হয়ে রয়েছেন। হে মনুষ্যত্বের একনিষ্ঠ পূজারী রেঁামা রোলা, তোমার গ্রন্থে তুমি আমাদের অন্তরের কথাটি জানিয়েছ—"বিবেকানন্দের প্রকৃত আদর সমাদর সম্মান পরশ্রীকাতর বিদ্বেষপ্রতিহিংসাপরায়ণ স্বদেশবাসী দিতে পারবে না, সমুদ্রের ও-পারের বিদেশী জাতি তাঁর যোগ্যতার মূল্য দিতে না পারলেও তাঁর সত্তা সততা সহৃদয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করবে। আমরা আপন ঘরের মানুষকে কি চিনেছি? আমরা দুর্দিনের শ্রেষ্ঠ বান্ধবকে কি আর বাক্যে কার্যে ভাবে কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছি? সেই মহামানবের আদর্শে আমরা জাতিকে তৈরি করবার কোন প্রচেষ্টা করেছি কি? আমাদের মন আমরাই হারিয়েছি, আমাদের অস্তিত্ব হারিয়েছি, সমস্ত সম্বল নিঃশেষ করেছি—আমাদের জীবনের কত বড় সম্পদ যে আমাদের অন্তরে বাইরে রয়েছে, তা ভুলেও আমরা মনে করি না। আজ আমাদের স্থান কোথায়? আজ আমাদের পরিণতি কোথায়? আমরা মানস-সরোবরের অমৃতরস পান ক'রেও স্বভাবের দোষে খাল-বিল-নালার বদ্ধ মৃত দূষিত জল খাবার জন্যে পাগল হয়েছি। আমরা আজ আত্মবিস্মৃত, স্বপ্নদুষ্ট, অধ্যবসায়লুপ্ত। আমাদের দেহ গিয়েছে, মন গিয়েছে, আত্মঘাতী মতবাদে জাতির সর্বনাশ হয়েছে। "ফুটবল খেলায় লাথি মারার" আঘাতেই স্বর্গ এসে ধরা দেবে, বিরামবিহীন কর্ম এসে জায়গা জুড়ে বসবে। পড়ি আর ভাবি, পড়ি আর ভাবি—দার্জিলিং-ভ্রমণে এসে আমার কত জীবনের দর্শন লাভ হ'ল! হে মনীষী লেখক! হে সত্য-ন্যায়-মুক্তির সেবক! তোমরা উভয়ে আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই রেঁামা রোলা গ্রন্থের শেষ পাতায় গিয়ে শিয়রের কাছেই খোলা পেলাম গর্কির 'মাদার'।

তন্দ্রা নেই, ঘুম নেই, জড়তা নেই—শুধু রয়েছে ভক্তি, বিশ্বাস,

কর্মশীলতা এবং কৌতূহলপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও একাগ্রতা। গর্কির 'মাদার' পড়েছি ব'লেই কখনও কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝেন, কোন দলের সেবক মনে না করেন। আমি ছেলেবেলা থেকেই একা, এখনও সেই একা। বংশের দীক্ষাগুরু আমাকে দীক্ষামন্ত্র দিতে সাহস পান নি আমার কথা শুনে—আপনার প্রসাদ নিতে পারি, আমার প্রসাদ আপনি নিতে পারবেন কি? গুরুশিষ্যে অভিন্ন সম্বন্ধ বা আত্মিক সম্বন্ধ না থাকলে কোন মন্ত্রের দীক্ষা বা শিক্ষা কার্য করে না—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বৈষ্ণবধর্মের ভক্তবৃন্দ এবং শৈবধর্মের ভক্তবৃন্দ ঘরের পাশেই ভিড় ক'রে ছিল, কিন্তু পরিষ্কারভাবে কোন দলের ভক্ত হই নি। দেখলাম, সবাই কেবল সঙ সাজে। জীবনের একটা উপসংহার করেছি, যে কোন জাতির, যে কোন ধর্মের, যে কোন শ্রেণীর খাঁটি মানুষই খাঁটি কাজ করতে সমর্থ হন। কোন দল বা সম্প্রদায়ই দলাদলি বা সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত নয়। সব জায়গায় এই দলের ভিড়ে সত্য মিথ্যা হয়ে গেল, মেকি পাকা হয়ে চলল, কোথাও কোন স্বাস্থ্যকর আলোচনা চলে না। প্রায় সব লোকই বিবাহের সময় যৌতুকের ফর্দ বা টাকার ফর্দ করেন বা করান। আমি আমার দারিদ্র্যের মধ্যেই বাবাকে লিখলাম, মেয়ের বাবার নিকট কোন চাহিদা করবেন না। বাবা মা যে চিরদিনের জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কন্যা দান করেন, তাঁকে বিব্রত করব না—স্বেচ্ছায় দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। আমি যে কোন দলেরই যোগ্য নই, তা সকলেই বুঝতে পারেন। গর্কির 'মাদার' গ্রন্থটি প'ড়ে রাশিয়াকে জানবার আকাঙ্ক্ষাই হ'ল প্রবল। সাহিত্যের আদর্শকে সেই দেশ কতটুকু রূপায়িত করেছে! শুধু রাশিয়া কেন? প্রত্যেকটি

দেশের আসল সত্যকে জানাবার জন্যে, গ্রহণ করবার জন্যে এবং ধারণ করতে গিয়ে আমি চিরকাল দলবহিভূ ত। মা ও ছেলের চমৎকার কথোপকথন শুধু চমৎকৃতই করে নি,—অন্তরকে অলঙ্কৃতও করেছে। মতবাদ ছাড়া আমাদের দেশে এমন মা ও ছেলেরই প্রয়োজন।

গর্কির 'মাদার' সম্বন্ধে সমালোচনা অনেকেই করেছেন, আমার তাতে বলবার কিছুই নেই। সবচেয়ে আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে গর্কির হৃদয়ের কথাগুলি—মানুষ নিজেকে বিশ্বাস করবে, আইনকে নয়। তার অন্তরে ভগবৎসত্য সে নিজেই বহন করবে। পৃথিবীতে সেস্পুলিসের কাপ্তান হয় নি বা ক্রীতদাসত্ব করবার জন্য জন্মায় নি। আইনের উপরে রয়েছে মানুষ, তার উপরে রয়েছে জ্ঞান, সবার উপরে রয়েছে হৃদয়। হৃদয়ের কথা, ভাবের কথা 'লেখক ও তাঁর লিখিত রচনা'কে অভিন্ন, অক্ষয় বা অচ্ছেদ্য ক'রে তোলে।

"Man must believe in himself not in the...Man carries tha truth of God in his soul, he is not a police captain on earth nor a slave."

গ্রন্থ দুখানি প'ড়ে গ্রন্থকারের মনের হৃদয়ের রঙ মিলিয়ে দেখলাম, সাহিত্য কারও জন্যে নয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য এ ভয়ঙ্কর জগতে সিদ্ধ হয়েছে কি? মানুষ বর্বরতার স্তর থেকে সভ্যতার স্তরে এসেছে কি? কোথায় সেই জীবন-সাহিত্য মেলে যেখানে মানুষ অন্তরটাকে দেখে নেয়—হৃদয়টাকেও চেয়ে নেয়। ধন্য আমাদের দর্শন! গ্রন্থ না প'ড়েই তার সম্বন্ধে কত সমালোচনা! গ্রন্থকারকে না বুঝেই তাঁর বনবাস? যে সব গ্রন্থের সামান্য অংশ গ্রহণ করলেই অমৃতের অংশীদার হওয়া যায়, হাজার গল্প-উপন্যাসের চেয়েও বড় সম্পদ

লাভ করা যায়, দেহের মনের ও প্রাণের পবিত্র জাগরণ হয়, তাদের 'বয়কট' ক'রে, তাদের বর্জন ক'রে, তাদের অপাঙ্‌ক্তেয় ক'রে পাঠক-সমাজ কত সর্বনাশ ক'রে যাচ্ছে! ছাইয়ের মূল্য বাড়ে, অথচ সোনার মূল্য বাড়ে না। রোঁমা রোলার মহাপথ (গ্রেট পাথ্‌স্) নামক প্রবন্ধের ২২২ পৃষ্ঠায় ভারতীয় আদর্শের অপূর্ব সঞ্চয়ন ক'রে তাঁর সংস্কৃত মনের বিশুদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন—

"পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবগণ অজ্ঞাতভাবে মায়া ছেড়ে গিয়েছেন। আমাদের বুদ্ধগণ এবং যীশুখ্রীষ্টগণ সেই অজ্ঞাত শহীদদের তুলনায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। প্রত্যেক দেশে এইরূপ শত শত বীর বেঁচে আছেন, যাঁদের সম্বন্ধে কোন ঘটনাই জানা যায় নি। নীরবে তাঁরা আসেন, নীরবে তাঁরা চ'লে যান এবং সময়মত তাঁদের সমস্ত চিন্তা বুদ্ধগণ ও যীশুখ্রীষ্টগণে প্রকাশ পেয়ে থাকে—সেই অপ্রকাশিত শত শত বীর শহীদের ভাবান্তরিত প্রকাশিত রূপ 'বুদ্ধ' এবং 'খ্রীষ্ট'। পৃথিবীতে মানবগণ তাঁদের জ্ঞান থেকে কোন নাম বা যশ পাবার জন্যে কখনও চেষ্টা করেন না। তাঁরা তাঁদের ভাবসম্পদ বিশ্বভাণ্ডারে রেখে যান, তাঁদের নিজেদের জন্যে কোন দাবিও রাখেন না বা কোন প্রতিষ্ঠান বা নিময়ও প্রবর্তন করবার ধার ধারেন না। তাঁদের সমস্ত প্রকৃতি এসব প্রচার থেকে বিরত। তাঁরা হচ্ছেন 'বুদ্ধশুদ্ধ' সাত্ত্বিক মহাপুরুষ, যাঁদের কোন বিকার নেই, যাঁরা প্রেমেতে গ'লে পড়েন।" মনীষী রোঁমা রোলা "বিবেকানন্দের অবিকল উক্তিটি" লিপিবদ্ধ করেছেন, পাছে কোন ভাবের বা শব্দের অমর্যাদা ঘটে। সেই অমৃত গ্রন্থের পাতায় পাতায় কত বড় মনুষ্যত্বের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক সাহিত্যিক!

আমাদের অন্যান্য গ্রন্থরাশির জ্ঞানভাণ্ডার এই সব সত্যিকারের অবদানের চেয়ে কত নগণ্য অপদার্থ!

একটি চরিত্রই যেন বিশ্বদর্পণ। প্রথম দিকে মনীষী লেখক প্রস্তাবনায় দেখিয়েছেন—অতিমানবীয় দেহ মস্তিষ্ক বর্তমান ও অতীতের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্বপ্ন ও কাজের সামঞ্জস্য স্থাপন করবার জন্যে সমগ্র শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। জীবন-সংগ্রাম ও জীবন-সাধনা হয়ে গেল এক। পরমহংসদেবের তিরোধানের ষোল বছর ছিল বিবেকানন্দের দাবানলের কাল। মনীষী যেন চোখের সামনে পাঠককে ধরিয়ে দিচ্ছেন—সেই চিতাশিখা অদ্যাবধি জ্বলছে। তাঁর পূত ভস্মরাশি থেকে ভারতের নব বিবেকের জন্ম হবে, সেই স্বরসাধক বিহঙ্গের আবির্ভাব হবে, যাঁর থেকে ভারতের ঐক্য, ভারতের বাণী (বৈদিক যুগ থেকে রূপায়িত) বিশ্বের দরবারে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হয়ে থাকবে।—"The flame of that Pyre is still alight to-day. From his ashes has sprung...the conscience of India—the magic bird—faith in her unity and in the great message, brooded over from Vedic times by the dreaming spirit of his ancient race—the message for which it must render account to the rest of mankind."

এই দার্জিলিং-ভ্রমণের দ্বিতীয় রাত্রির শয়নের পূর্বে অধ্যয়নের মধ্যেই এমন একটা আনন্দ পেলাম, যার অন্ত নেই। একটা সংশয় দূর হয়ে গেল—ভাবের ও হৃদয়ের জগৎটা এক রকম, জ্ঞানের জগৎটাই অন্য রকম। পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামার মধ্যে যে আনন্দ আছে সে আনন্দ সকলের কাছে ধরা দেয় না, সরলভাবে নেবার যার ক্ষমতা

আছে তার কাছেই ধরা দেয়। নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রকৃত ভারতবর্ষের রূপ দেখা দিতে লাগল। খালিপেটে যে ধর্ম হয় না, যারা অপমানিত অবজ্ঞাত ও পশ্চাৎপদ তাদের আপন করবার মত, আত্মীয় করবার মত যে হৃদয় নেই, প্রাণ নেই—তাদের উন্নতির পথে বাধা জন্মাবার জন্যে যে উপরের লোক রয়েছে, তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে যে অনুগ্রহ দেখাবার প্রস্তাব চলছে, আন্দোলন হচ্ছে, তার প্রকৃত রূপ দেখে বিবেকানন্দ "দেশ দেশ" ব'লে চীৎকার ক'রে কেঁদেছিলেন—সেই সত্য বার বার প্রত্যক্ষ হতে লাগল। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ উদার গম্ভীর স্বরে মহাত্মা গান্ধীর মত মর্মস্পর্শী বাণী উচ্চারণ ক'রে ঘোষণা করেছিলেন—সমগ্র জাতির দরিদ্রের ভগবান, আর্তের ভগবান, পতিতের ভগবানকে সমগ্র আত্মার শাশ্বতরূপে পূজা করবার ক্ষমতা লাভ করবার জন্যে আমি বার বার জন্ম নিয়ে তাদের সমগ্র দুঃখের অংশ গ্রহণ করতে পারি।

হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতা-কলঙ্ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মহাত্মাজী, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও গভীর দুঃখে অনেক কথা বলেছেন। এই নির্জন নিশীথে ভ্রমণের অবসর সময়ে যে পরম সত্য লাভ করলাম, তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ।

দার্জিলিঙের এই সুন্দর রূপের অন্তরে কোন্ কালো রূপ আছে, তা প্রত্যক্ষ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। তৃতীয় দিন লেবং অভিযানে দার্জিলিঙের স্বরূপ আবিষ্কার করব ভাবছি। রংগিত রোড থেকে নেমে ভিতরের রাস্তা দিয়ে স্বামীজীর ভারতবর্ষের আর একটি চিত্র প্রত্যক্ষ করব। তখন রাত্রি প্রায় তিনটে। ভাল খাদ্য পেলে এভাবে জেগে থাকার অভ্যাস এখনও আছে।

গর্কির 'মাদারে'র প্রত্যেকটি পাতার ক্ষুধিত, নিরন্ন, পতিতদের

আর্তনাদ করুণভাবে কানে এল। ঐ সব দেশের সকলেই প্রতিকার করবার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগে, আমাদের দেশের লোক অনুগ্রহ ক'রে সামান্য কিছু দিয়ে তুষ্ট রাখবার জন্যে প্রস্তাব করে এবং প্রচার করে—এই যা তফাত। সমুদ্র—মহাসমুদ্রের পরপারে সমস্ত বিশ্বের দিকে আত্ম-নিবেদন ক'রে বিশ্বদর্শন করলেন। ভারতের স্বাস্থ্য জগতের শক্তি, ভারতের দারিদ্র্য বিশ্বের মৃত্যু, ভারতের ঐশ্বর্য বিশ্বের সৌন্দর্য, ভারতের বিভাগ বিশ্বের বিরাগ, ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদে যখন আঘাত পড়বে তখন ভারতের আত্মার বিনাশ অনিবার্য। সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে ভারতের ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য এবং জনসাধারণের অশেষ দুঃখ ক্লেশ প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছেন যে, ভারতের আর্থিক দুর্গতি এবং অন্নসমস্যার শোচনীয় পরিণতি দূর না করা পর্যন্ত অন্নক্লিষ্ট, ছিন্নবস্ত্র এবং অর্ধমৃত জাতির সামনে ধর্মের বা স্বাধীনতার কথা প্রচার করা একেবারে নিষ্ফল।

"ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।"

অনন্ত শক্তিমান আছেন উপরে। অনন্ত পথের উপর দিয়ে আমাদের চলতে হবে। দার্জিলিং উপলক্ষ্য মাত্র। পথের মধ্যে কষ্ট আছে, দুঃখ আছে—পথের মধ্যে ভালবাসাও আছে। সহস্র দিক থেকে অবিশ্রাম ভালবাসাকে যারা গ্রহণ করে, পথ তাদের বাধা জন্মায় না কখনও। এই পথ দিয়ে চলতে চলতেই গর্কির মাদার যেমন সমন্বয় খুঁজেছিলেন,

স্বামীজীও সেই সত্যই খুঁজেছেন। একজন শুধু দেহের, আর একজন দেহ ও দেহীর, আত্মার এবং বিশ্বের। স্বামীজী বিশ্বসমন্বয় চেয়েছেন দানে পবিত্রতায় এবং ভগবৎসত্তাতে, আর গর্কি চেয়েছেন শ্রমে এবং সেবায়। উভয়েই সত্যিকারের স্বাধীনতা এবং মুক্তির উদ্দেশ্যে গেয়েছেন—এমন সময় আসবে, যখন প্রত্যেকটি লোক প্রত্যেকটি লোককে ভালভাবে জেনে সংগীতের মত অপরকে অনুসরণ করবে, প্রত্যেকেই নক্ষত্রের মত যোগসূত্রে বাঁধা থাকবে—হিংসা-লালসা থেকে মুক্ত থেকে খোলা হৃদয় ও খোলা প্রাণ নিয়ে চলবে এবং সমস্ত দেশের মানবজাতি যুক্তির উপরে হৃদয়কে প্রতিষ্ঠিত ক'রে—লাইফ উইল্ বী ওয়ান গ্রেট সার্ভিস টু ম্যান ("Life will be one great service to man") সত্যকে চিন্ময় ক'রে ফেলবে। রোঁমা রোলা স্বামীজীর আদর্শকে দেখেছেন আরও উপরের দিকে। আমাদের লক্ষ্য হবে সাধুতা, বিশুদ্ধতা এবং দানশীলতা—কারও ব্যক্তি-বিশেষের সম্পদ নয়। প্রত্যেকটি জাতির ধর্মনিশানে উড়বে—সমন্বয়, শান্তি এবং সহযোগিতা। ভারতের কোটি কোটি লোকের জন্যে আমাদের প্রত্যেককেই দিনরাত প্রার্থনা করতে হবে, যাদের জীবন দারিদ্র্যে, পুরোহিতের জঘন্য অত্যাচারে এবং শক্তির অপব্যবহারে আবদ্ধ হয়ে আছে।

Gorkie's Mother=Life (there will come a time I know, when people will take delight with one and when each will be a star to the other. The free men will walk upon the earth, overgreat in freedom. They will walk with open hearts and the heart of each will be pure of envy and greed. Then life will be one great service to man.

Let each one of us pray day and night for the down-trodden millions of India, who are held fast by poverty priestcraft and tyranny. Pray day and night for them.

কোথায় সেই মনের সাহিত্য আর কোথায় এই প্রাণহীন ধরণী? কোথায় সেই সব সাধকের প্রেমময় বিশ্বাসপূর্ণ চরিত্র আর কোথায় চরিত্রহীন ধনপূজারী মানব? এখানে কেউই কাউকে জানতে চায় না, বুঝতেও চায় না—এখানে সহানুভূতি নেই, যোগা-যোগ নেই, নেই সেই harmony and peace—সমন্বয় ও শান্তি। এ কি মানুষের পৃথিবী? কে সেই প্রাণ নিয়ে উচ্চারণ করে—আমি দরিদ্র, দরিদ্রকে আমি ভালবাসি? অজ্ঞতায় ও দারিদ্র্যে কোটি কোটি লোক জীবন্মৃত হয়ে আছে, তাদের জন্যে কে আর ভাবছে? কে দেখাবে আলো? কে দেবে মুক্তি? এই সব দরিদ্রই আমাদের নারায়ণ। পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, দেশ সমাজ—কোথাও এমন মহাত্মা মেলে না, যাঁর প্রাণ দরিদ্রের জন্যে বিদীর্ণ হয়। যত দিন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোক অভুক্ত এবং অজ্ঞাত থাকবে, তত দিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি লোক স্বামীজীর আদর্শে বিশ্বাস-ঘাতক ব'লে গণ্য হবে—তাদেরই ত্যাগে শিক্ষা পেয়ে তাদের প্রতি কোন মনোযোগ দেওয়া হয় নি।

রাত্রি প্রায় তখন তিনটে। আমার ঘরের আলো এতক্ষণ আমাকে নিয়েই কালকের পথ খুঁজেছিল। পাশের ছাত্রবন্ধুটি জেগে বললেন, আর কতক্ষণ?

এখানেই শেষ। দু ঘণ্টা নিদ্রার পর জেগে "দেখব আবার জগৎটাকে"। লাইট অফ হয়ে গেল।

"...So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor, who having been educated at their expenses, pays not the least heed to them."

লেবং অভিযানে—তৃতীয় দিবস

আজকে দার্জিলিঙের তৃতীয় দিন। লেবং অভিযানের দিন। যেতে হবে সেই পথ দিয়ে, যে পথে গাড়ি-ঘোড়া চলে না, দু-একজন পথিক পায়ে হেঁটে চলাফেরা করেন। ভোরের আলোতে গত রাত্রির স্মৃতির রেশ ব'য়ে গেল। মনের মধ্যে কত প্রশ্ন! কত তার উত্তর! চল্লিশটি বছরের অভিজ্ঞতার মধ্যে বড় সত্য বের হয়ে গেল—বিপদে আমি একা, সম্পদে আমাতে বহু। ভাব যেখানে নেই, সেখানেই মৃত্যু।

বিশ্ব কি? কি ভাবে তার জন্ম? কোথায় তার গতি? উত্তর এল—স্বাধীনতায় তার জন্ম, স্বাধীনতায় তার বিশ্রাম, স্বাধীনতায় তার লয়। এই সত্যের মুক্তিপথ ধ'রে আটটার সময় একা চলতে আরম্ভ করলাম। ম্যালে সামান্য দশ মিনিটের মত আরাম ক'রে রংগিত রোডের দিকে পা বাড়ালাম। সে সময় আলো-আঁধারির সঙ্গে মেঘ-কুয়াসার খেলা চলছে। ম্যাল থেকে পূব দিকে মুখ ফিরিয়ে লেবং রোডে নামবার সময় মেঘের খেলা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মাথার উপরে মেঘ, তার উপর রক্তিম রবির আলোর পরশ, ডান হাতে মেঘ অথচ পায়ের দিকে কুয়াসা, সামনেই আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, পশ্চাতে আবার রোদের খেলা।

প্রকৃতির বিচিত্র খেলা দেখে পরমপুরুষকে প্রণাম জানালাম। বার্চহিল রোড বাম দিকে রেখে ডান দিকে লেবঙের রাস্তা ধ'রে নামতে শুরু করলাম। ধাপে ধাপে নেমে নেমে চলা সহজসাধ্য নয়। যতই নেমে চলেছি, ততই পাহাড়ের সঙ্গে পর্ণকুটীরের মিল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। যেখানে সেখানে ভাঙা পাথর প'ড়ে আছে, কত রকমের গাছপালা চার দিকে আছে, তাদের কাজে লাগাবার প্রাণ নেই। পর্ণকুটীরের মাঝে পূর্ণলক্ষ্মী নেই। কোথাও ছেঁড়া কাপড় পরা পল্লীর মা লজ্জায় মাথা নত ক'রে নীরবে ভগবানের নিকট নালিশ জানাচ্ছে। আবার কোথাও ভাঙা থালায় ভরা পান্তাভাত কয়েকটি লঙ্কা-পেঁয়াজ সহ অর্ধনগ্ন ও শীর্ণদেহ বুভুক্ষু শিশুদের শিয়রে শীতশ্রান্ত হয়ে প'ড়ে আছে। কোথাও সেই কর্তার অভাবজনিত অন্তরবিদীর্ণ কোলাহল, আর কোথাও বা ওষ্ঠাগত কণ্ঠহীন রোগীর করুণ নিবেদন! দার্জিলিং পাহাড়ের উপরের দিকে কি দেখলাম, আর এখানে কি দেখছি! পাহাড়ের শিখরদেশ সকলকেই আকর্ষণ করছে, কিন্তু শিকড়দেশ যে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে, সে দিকে কারও দৃষ্টি নেই। প্রায়শ্চিত্তও আরম্ভ হচ্ছে। শিকড়ের শক্তি নেই ব'লে শিখরের সৌন্দর্য অতল অন্ধকারে হচ্ছে বিলীন। সব দিকে অবসাদ, প্রমাদ, বিলাপ—অস্তিমের প্রলয়-আহ্বান।

এত যে মৃত্যু, তার মধ্যে আনন্দ কোথায়! তবু মানুষ তার মধ্যেই মাঝে মাঝে কি যেন চায়, কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়! হঠাৎ একটি পর্ণকুটীরের ভাঙা পাথরের বুকে কয়েকটি মৃত্যুহীন লেখা দেখলাম—

In memory of Dhan Bahadur Subba—A recruit for active service of a Coy. 1-7th Gurkha Regiment—Born 1897, died quietly on 2. 6. 1915, aged 18 years.

নেপালী ভাষায় তার অনুবাদও তার গায়ে লেখা আছে। ধন বাহাদুর সুব্বার স্মৃতিরক্ষার্থে এই কয়েকটি অক্ষরের পরিচয়। ১৮ বৎসর বয়সের একটি গুর্খা যুবকের প্রাণ উৎসর্গের ভেতরে যে অকুণ্ঠিত প্রভুভক্তি এবং সেবানুরাগ রয়েছে, তার কথা ভাবতে লাগলাম।

'চার্জ অব দা লাইট ব্রীগেডে'র

"Into the valley of Death
Rode the six hundred."

কথাগুলি দাগ কেটে গেল। ভক্তি ভক্তিই, সেবা সেবাই,—তার মধ্যে যুক্তি-তর্ক, বাদানুবাদ বা সন্দেহ-শঙ্কা থাকবে না। ধন বাহাদুর সুব্বা! তুমি এখন কোথায়? দেহ তোমার মিশে গিয়েছে পঞ্চভূতে। তুমি বেঁচে আছ তোমারই ত্যাগে—সেবায়।

"আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধবে।
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।"

শহীদ! তোমার ভয় কিসের! তুমি মৃত্যুসাগর মথন ক'রে অমৃতরস হরণ ক'রে এনেছ।

লিখতে, পড়তে, ভাবতে একটু সময় গেল। এবার হাঁটতে আরম্ভ করলাম। থামলে আর চলবে না, আবার ফিরতে হবে। পাহাড়ের দেশে পায়ে হাঁটাতে মন চলে না—অনেক জায়গায় থেমে একেবারে বসিয়ে রাখতে চায়। যেতে হ'লে দেহ-মন দুই-ই চলুক বা না চলুক, তাকে চালাতে হবেই। পদযুগলকে দিচ্ছি ধন্যবাদ আর হেঁটে যাচ্ছি। ছেলেবেলায় যে সব জায়গায় ঘুরেছি, সেখানে গাড়ি-ঘোড়ার চল ছিল না। পায়ে হেঁটেই যেতে হ'ত।

তখনও ১৫।১৬ মাইল দূরের মামার বাড়ির থেকে আসা-যাওয়া করতে হ'ত পা দিয়ে। ২০।২৫ মাইল পায়ে হেঁটে দূর থেকে পুরনো পড়ার বই এনেছি, ৪।৫ মাইল হেঁটে কলেজে ছাত্র পড়িয়েছি। পাও আছে, পথও রয়েছে—চলার তো শেষ নেই। যৌবনেও তার বিরাম ছিল না, যৌবন পার ক'রেও তাকে অবসর দেবার সুযোগ পেলাম না। গরিবের সবচেয়ে বড় সম্বল এই পা ও হাত। যতই তাদের চালানো যায়, ততই জীবনটি চলে ভাল, জীবনের অনেক সমস্যার সহজে সমাধান হয়। দেহকে রাখে দৃঢ় সবল এই চলন্ত পদযুগল, মনকে রাখে সুস্থ ও সজীব, চোখকে বিশ্বের বিরাট দরবারে নিয়ে গিয়ে কত জিনিস দেখায়। এর আনন্দ হতভাগ্য পথভ্রষ্ট ও পদভ্রষ্ট অচল ধনীর ও বিলাসীর সন্তান কখনও লাভ করে না। আমাদের দেশের আভিজাত্য এবং ঐশ্বর্য এমনি জিনিস যে তা চলকে অচল করে, চারিদিকে মৃত্যুর বেড়া দেয়, তা জ্ঞানীকে অজ্ঞান ও অপদার্থ জীবরূপে প্রকৃতির কৃপাপাত্র ক'রে দেয়। পায়ে হেঁটেই পথের ও পথিকের পরিচয় মেলে, আপন-পর ধরা পড়ে—জীব ও জগতের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। বাঙালী জাতির বড় গৌরবের সম্পদ ছিল এই পদযুগল। ৭০।৮০ বৎসরের বৃদ্ধ সের খানেক শক্ত চিঁড়ামুড়ি খেয়ে ২০।২৫ মাইল হেঁটে গিয়ে রামায়ণ-মহাভারতের পালাগান করতেন ও শোনাতেন, ৮।১০ বাটি পায়েস খেতে পারতেন, চশমা না প'রেও গীতা চণ্ডী অনায়াসে পাঠ করতে পারতেন, ছুঁচের ভিতরে সহজে সুতো পরাতে পারতেন। পায়ে হেঁটে বুকের পাটা যেমনি শক্ত রাখতেন, হাতের পাঞ্জাতে তেমনি অন্যায়কারীদের প্রাণটি রেখে শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতেন। কাজেই আমাদের দেশে চাষ ছিল ভাল, চাষী ছিল ভাল, মাঠঘাট ছিল সরস ও সুন্দর, শাকসব্জী

ছিল সতেজ ও সজীব। আজ পায়ে হাঁটার সাথী খুবই কম, প্রাণ রাখার দরদী বান্ধবও কম। দূর থেকে উড়ে উড়ে বা মোটর হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে দুর্গতদের, বিপন্নদের, আর্তদের আবেদন-নিবেদন নেওয়া হয়—পাও হাঁটে না, চোখও দেখে না, কাজেই সব দিকে থাকে ভুল এবং গোল। নাগালই পাওয়া যায় না প্রাণের মূলের।

চলল—একই ভাবে নেমে নেমে ঘুরে ঘুরে মোড় ফিরে ফিরে চলা। একই রকমের পাথর, একই রকমের কুটীর, একই রকমের গাছ লতা পাতা চোখের সামনে পড়তে লাগল, যারা পেছনে রইল তাদের দিকে ফিরে তাকাবার সময় পাই নি। তবু চলেছি একা, চলার আনন্দে ছিল না বিষাদের রেখা—অর্থহীন হ'লেও স্বার্থহীন ছিলাম ব'লেই "সকল অভাব চূর্ণ ক'রে" এগিয়ে চলেছি। কোথায় সেই লেবং? কোথায় সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠ? কোথায় সেই রংগিত নদী? তারা আছে আরও বহুদূরে। যাবার পথে একটি বাজার পড়ল। বাজারের চেহারা ঠিক পাহাড়িয়াদেরই মতন—কলকাতার বা অন্যান্য বড় শহরের মত কোন জিনিসই ভালভাবে সাজানো নেই। বাঘের মত ক্ষিধে লেগেছে, ক্ষিধের আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। গ্রামের ছেলের খোরাকি শহরের ছেলের মত নয়। কলেজ-হোস্টেলে প্রথম শ্রেণীর রাক্ষস-ভোজনকারীদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন। একবার বন্ধু শৈলেনবাবুর বিয়ের এক উৎসবে খেতে ব'সে মাছ-মাংস প্রচুর খেয়ে প্রায় এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন, এক বাটি ক্ষীর এবং দুটো বড় বড় ফজলী আম খেয়েছিলাম। আমার দশ ভাগের এক ভাগ খেয়ে পৃথ্বীশবাবু এবং ৺মতীন্দ্র বর্ধন সোডা খেলেন। আমি সোডা না খেয়েও একেবারে নির্বিকার। চা, মিষ্টি, কেক খেতে গেলে অনেক টাকা লাগবে। আধ সের চিঁড়ে নিয়ে পকেট ভর্তি করলাম।

দোকানে ব'সেও প্রায় এক পো চিঁড়ে, এক বাটি মুড়ি এবং দশটি চাঁপাকলা গলাধঃকরণ ক'রে চললাম। ক্ষিধের আগুন পেটে থাকলে সব জিনিসই লাগে ভাল। ছটা কাঁচা ডিম খেয়ে প্রাতর্ভোজন শেষ ক'রে নিলাম।

প্রায় দশটার সময় লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে হাজির হলাম। ম্যাল থেকে লেবং মাঠটিকে কেমন দেখেছিলাম, আর এখানে এসে কেমন দেখছি! দূর থেকে কত কুৎসিতকে সুন্দর দেখায়, কত অমানুষকে মানুষ মনে হয়, কত সজ্জনকে কুজন ব'লে প্রচার করা হয়! মানুষকে সবচেয়ে ভালভাবে চেনা যায় তার নিকটে থেকে। প্রকৃতির অনেক জিনিসও প্রত্যক্ষ না ক'রে তার আসল স্বরূপ ধরা যায় না। ঘোড়দৌড়ের মাঠের অবস্থার সঙ্গে মনের অবস্থা মিলিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে বাধ্য হলাম; কারণ এবার ধাপে ধাপে পাহাড়ে সিঁড়ি চ'ড়ে চ'ড়ে উপরের দিকে চলতে হবে। নামতে গেলে যত কষ্টই হোক না কেন, ওঠবার মত পায়ের জোর লাগে না। যেতেই হবে দার্জিলিঙে, মাঝখানে তো আর ব'সে থাকা চলে না। আরম্ভ করেছি, শেষ করবই। সঙ্কল্পে দৃঢ় হ'লে তো দুর্বলতা থাকে না, সন্দেহ থাকে না, অবিশ্বাসও থাকে না। উপরের দিকে উঠছি আর ভাবছি—যেটুকু জেনেছি, জেনেছি ব'লে গর্ব করেছি, সেটুকু তুচ্ছ হয়ে আছে। যেটুকু জানা যায় নি, সেটুকু বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। যেটুকু পাই নি, সে যে পাওয়া জিনিসের চেয়ে বেশি সত্য ব'লে মনে হচ্ছে, ধাপে ধাপে সোপানে সোপানে এবার বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। উপরের দিকে ওঠা কত যে ভয়ানক শক্ত এবং কত যে আনন্দে পরিপূর্ণ! এখন মন ছুটে যেতে চায়, উড়ে যেতে চায়, কিন্তু চলন্ত অবশ পায়ের ভার ভারাক্রান্ত ক'রে রেখে দেয়। মাইলের

গণনা ক'রে মনে করেছিলাম, ঘণ্টায় তিন মাইল সহজেই চ'লে যাবে; কিন্তু হিসেবে সব ধরা প'ড়ে গেল।

ওপরে ওঠবার সময় দেখলাম, ঘণ্টায় জোর এক মাইল ক'রে উঠেছি। এবার বোঝা গেল, ওপরের চাপ মানুষকে নীচের দিকে কতদূর ঠেলে রাখে, আর পাগুলো কেমন দৌরাত্ম্য ক'রে সব চাপ ঠেলে দেহকে ওপরের দিকে তুলে নেয়। পরিষ্কার হয়ে দেখা দিল—কল্পনার মানুষ আর কাজের মানুষ এক নয়। কাজের লোকই আসল লোক, যদি আসল পথে চলে। ভোগের দ্বারা এই পৃথিবী ছোট হয়ে আসে, খর্ব হয়ে যায়। নিজের মধ্যে এবং পৃথিবীর মধ্যে যা পাচ্ছি, তাতে সামান্য প্রয়োজন মিটে যায়; কিন্তু জীবনের রহস্য দুর্ভেদ্য প্রশ্নজালে ঘেরা থাকে। এ দিকে মধ্যাহ্ন নেমে এল, অন্য দিকে প্রকৃতির লাবণ্যরাশি সৌন্দর্যের কারখানায় প্রস্তুত হয়ে আছে। ম্যালে পা বাড়াবার আগেই যেন 'চিত্রা'র বিজয়িনী রূপসী হয়ে মূর্তিমতী হ'ল—

"অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে; তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন-রৌদ্র—ললাটে, অধরে,
উরু 'পরে, কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়,
বাহুযুগে, সিক্তদেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
... ...

সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে ; ছায়াখানি রক্তপদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া—
অরণ্য রহিল স্তব্ধ বিস্ময়ে মরিয়া।"

ম্যালে এসে দেখি, মেঘেতে দার্জিলিং পাহাড় সিক্ত আবার মধ্যাহ্নের রৌদ্রেতে সমস্ত পদতল রক্তাক্ত আর অরণ্য বিস্ময়ে স্তব্ধ—যেমন মেঘ তেমনি পৃথিবী। আমাদের সুখ দুঃখ ক্লান্তিতে কোথাও তারা অবসন্ন হয় নি। নব নব মেঘের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিরজীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। পরম নিভৃত পরিবেষ্টন রচনা ক'রে তারা মনকে উতলা ক'রে তোলে এবং অপরূপ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে তাকে ঘিরে রাখে। ছোট পৃথিবী স'রে দাঁড়ায় আর বৃহৎ পৃথিবী উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। এই প্রকৃতির রাজ্যে তানও আছে, সম্ও আছে, উদ্যমও আছে, আশ্বাসও আছে। প্রথমে সমস্ত মায়ার বন্ধন ছেদন ক'রে ভূমার সঙ্গে বেঁধে দেয়, আলোকের পথে বার ক'রে দিয়ে সন্ধ্যার আলোছায়ায় শান্ত হাসিতে ঘরে টেনে নেয়।

ম্যালে এসে একটা বেঞ্চির এক পাশে ব'সে পথের আনন্দ পেতে লাগলাম। প্রকৃতির চারিদিকে গভীর সামঞ্জস্য আছে, সে আনন্দ সীমাকে জেনে অন্তঃকরণে জাগে—অশিক্ষিত মন অগভীর অংশকে পেয়েই কপটতার আড়ম্বর করে ; কিন্তু শিক্ষিত মন সেই আনন্দের সমুদ্রে 'কাকস্নান' করে না, তাতে সাঁতার কাটে, ডুব দিয়ে দিয়ে গভীর আনন্দ লাভ করে। দূরবর্তীর সহিত যোগ-সংযোগে আনন্দ,—পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্য-সাধনের আনন্দ ভিতরে প্রবেশ ক'রে স্থায়ী হয়, গভীর হয়, ব্যাপক হয়, যতটা, ক্ষয় হয়ে জীর্ণ হবার কথা ততটা হয় না। এখানে মনের একটা শ্রেষ্ঠতর আদর্শ আছে। লোলুপ

ইন্দ্রিয়গণ ভিড় ক'রে দাঁড়ায় না ব'লেই মন ভাবের সৌন্দর্য আবিষ্কার ক'রে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগীত রচনা করে। আজ সমস্ত দিকে পল্লব যেন স্পন্দিত, ঘনায়িত অন্ধকারে চারিদিক শ্যামায়মান, কান যে মাধুর্য পায় না মন তার অনেকখানি পায়। আকাশ থাকে মেঘে আবৃত, কুয়াসায় আচ্ছন্ন; অরণ্য থাকে ছায়ায় আবৃত; গিরিশিখর থাকে আলোছায়ার মেঘমালার সৌন্দর্যভারে নীলিমাচ্ছন্ন বা স্থির সৌন্দর্যে আন্দোলিত ও হিল্লোলিত।

বেলা তখন আড়াইটে হবে। একটি ব্যাগ নিয়ে এক ডাক্তার পাশে ব'সে আরাম করছেন। ডায়েরিতে পাহাড়ের দেশের দুদিন ভ্রমণের রেকর্ড দেখে আমাকে সাবধান ক'রে বললেন—এমন দুঃসাহস কখনও করবেন না। পাহাড়ের দেশে সমতলভূমির মত এত পায়ে হেঁটে চলা-ফেরা করতে নেই। লাভের চেয়ে ক্ষতি হবে বেশি। অ্যাব-ডমিনাল ফাংশনে বিশেষ ব্যাঘাত হবে।

তিন দিনে দার্জিলিং পর্ব শেষ ক'রে যাবার দিন বিশ্রাম নিয়ে যাব। হাতে সময় নেই, ব্যাগে টাকা নেই; কিন্তু পাওনাটা যে ষোল আনা আদায় ক'রে যেতে চাই!

ষোল আনা আদায় করতে গিয়ে যে শেষকালে অনেক দায়ের তলে প'ড়ে যাবেন।

তবু নিয়মকে বাদ দিয়ে অনিয়মকে আপাতত মানতেই হবে।

বাঙালী জাতির মধ্যে আজকাল এরূপ কর্মবীর মেলে?

আর লজ্জা দেবেন না। একঘেয়েমির পালা ছেড়ে হঠাৎ পেয়েছি বৈচিত্র্য, কাজেই যতটা পারা যায় দেখব, জানব, লুঠব।

পাহাড়ের দেশের বৈচিত্র্য পথিকের বা পরিব্রাজকের চোখেই ধরা

দেয়। আমাদের চোখে কিন্তু পাহাড় পাহাড়ই, পাথর পাথরই, মেঘের বিচিত্র খেলা চিত্রহীন, রঙিন তো নয়।

বেলা তিনটার সময় ঘরে ঢুকে দেখি, সেই তিনটি ছাত্রবন্ধু সেই তাসখেলা নিয়ে মেতে আছে। তাদের তাসের ঘরই দার্জিলিঙের বাসরঘর এবং আসরঘর। খাওয়াটা শেষ ক'রে এসে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য হলাম। জীবিতে জীবিতে এইখানেই লড়াই হয়। দার্জিলিঙে এসে একটা আবদ্ধ ঘরে তিনটি যুবক এমনভাবে সময় কাটাতে পারে এবং মহারাজের দানের সুযোগের এমনভাবে সদ্ব্যবহার করতে পারে—দেশ আবার জাগবে কি? এরাই তো হবে বাংলার জ্বলন্ত ভবিষ্যৎ। যে বাংলার যুবক সারবান ওক বৃক্ষের মত চিরকাল ঝড়-বৃষ্টিতে তুফানে অচল থেকে দেশকে গৌরবান্বিত করেছে, প্রাচুর্যশক্তিতে সমৃদ্ধ করেছে, সে দেশের যুবকগণ যদি তাসপাসাখেলার ক্রীতদাস হয়ে থাকে, ধূমপানাসক্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে, অতিরিক্ত চলন্ত ছবি দর্শনে, ক্রীড়াসক্তিতে মত্ত হয়ে যৌবনেই দেহভগ্ন, মনোরুগ্ন এবং দুঃখভীরু কর্মভীরু হয়ে পড়ে, তবে আমাদের ভরসা কোথায়? তারা যদি কাঁটা গাছে উচ্চ ডালের প'রে পুচ্ছ লাগিয়ে মরণবনের গহন অন্ধকার থেকেই অমৃতরস বহন করতে সমর্থ না হয়, তবে সে যৌবন মৃত্যুকেই অকালে আহ্বান করে। আমাদের বাংলার যুবক চিরকাল পথহীন সাগরপারের পান্থ হয়ে অজানার বাসার সন্ধানে অশান্ত অক্লান্ত রয়েছে—তারা ঘরের ছেলে হয়ে বিশ্বকে বিস্মিত করেছে, অবাক করেছে, আবর্জনার গ্লানিভার দূরে রেখে ভারতের সোনার মুকুটখানি বহন ক'রে এনেছে। বাংলার প্রথম যুবক রামমোহন "কালাপানির কাল অভিশাপ" থেকে দেশকে মুক্ত ক'রে পাশ্চাত্য দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সামনে ভারতের গৌরবমুকুট উজ্জ্বল ক'রে

রেখেছেন, বাংলার ব্রহ্মানন্দ 'নাথিং' ও 'এভ্রিথিং' সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে ভারতকেই শ্রদ্ধার পাত্র করেছেন। বাংলার যুবক বিদ্যাসাগর, যুবক আশুতোষ, যুবক নেতাজী, চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দ বিশ্বের অপূর্ব সম্পদ।

তিনটি যুবক ছাত্রবন্ধুকে আবার বের হবার পূর্বে জানিয়ে গেলাম—

"খড়্গ সম তোমার দীপ্তশিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্ঝটিকা।

* * *

সূর্য তোমার মুখে নয়ন মেলে
দেখে আপন ছবি।"

চারটের পর চ'লে গেলাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কুটীর দেখতে। সামনেই লেখা রয়েছে "স্টেপ অ্যাসাইড", প্রবেশপথে রয়েছে তাঁর অমর পুষ্প জীর্ণতার ও জড়ত্বের বক্ষ দু ফাঁক ক'রে। দেশবন্ধু তো কুটীরের অর্থহীন নাম রাখেন নি, এর গভীর অর্থ নিশ্চয়ই আছে। এখানে এসে একটা নূতন জগতের নূতন সত্য বের হয়ে পড়ল। কার এখানে প্রবেশের অধিকার নেই? কে এই স্মৃতিমন্দির থেকে দূরে থাকবে?

যাঁরা চালিয়াতি বা চালাকি করেন, তাঁরাই মিথ্যা বলেন বেশি, সত্যকে মিথ্যায় সাজিয়ে এবং মিথ্যাকে সত্যে সাজিয়ে বন্ধুত্বের একটি সাজানো বাগান তৈরি করেন, তাঁরা সত্যিকারের মানুষকে বলি দিয়ে অপদার্থ এবং কপট ধূর্তকে প্রশ্রয় দেন। দেশবন্ধুর কুটীর থেকে এই প্রথম সত্য আমার ভ্রমণের পথে দেখা দিয়েছিল। এই চালিয়াতদের বা ফাঁকা লোকদের সেই পবিত্র স্মৃতি-কুটীর থেকে দূরে স'রে দাঁড়াতে হবে, প্রবেশের অধিকার নেই।

যাঁরা সত্যের ভগবানকে, আলোর ভগবানকে, বিচারের এবং সততার ভগবানকে দূরে রেখে বিশ্বাসকে এবং ক্ষমাকে পদদলিত করেন, উপরে ভালবাসা এবং নীচে ঘৃণা পোষণ করেন, তাঁরা এই সত্যের ও সেবার মন্দির থেকে দূরে স'রে থাকবেন, কারণ এই সব মেকী ভালবাসাবিলাসী দরদী বন্ধু কোন সামান্য উপলক্ষ্য ক'রে বা কোন অর্থহীন বিবাদের সৃষ্টি ক'রে অন্তরের দেবতাকে পদদলিত করেন এবং মনুষ্যত্বকে যার-তার কাছে বিক্রি করেন। তাঁরা স্বার্থটি উদ্ধার করেন অথচ অন্তরে শত্রুতা পোষণ করেন, তাঁরা পরের কাছে সত্যিকার মানুষের প্রশংসা করেন অথচ কাজের সময় ভয়ঙ্কর ভাবে তাঁদের অনিষ্ট সাধন করেন। এই সব মেকী দুর্বল বিশ্বাসী লোকই পরের কথায় নাচেন, প্রশংসা পাবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকেন, অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দিয়ে ন্যায়কারীদের দমন করেন, পাছে সব দুর্বলতা বের হয়ে পড়ে। তাঁরা শত্রুর চেয়েও ভয়ঙ্কর, বিশ্বাসঘাতকের চেয়েও জঘন্য, কারণ তাঁরা সোনার মানুষ চিনতেই পারেন না, যেখানে সোনার ফসল ফলাতে পারতেন সেখানে ফসলের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেন। তাঁরা দুঃশাসনকে মাথায় ক'রে বেড়ান আর যুধিষ্ঠিরকে বিসর্জন করেন, তাঁরা বীর্যের বা বীরত্বের সম্মান করেন না, পরিণামে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত লাঞ্ছিত ও অবনত হন। এই সব কপটাচারীর সেই সেবকের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই, তাদের জন্যেই লেখা রয়েছে—"স্টেপ অ্যাসাইড"।

যাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত পবিত্র হৃদয়ের স্নেহ-ভালবাসার গৌরব রক্ষা করতে পারেন না, সামান্য বিষয়েই আহত হয়ে অক্ষয় সম্পদকে বিনষ্ট করেন, বিসর্জন করেন, তাঁদের মত বিশ্বাসহীন লোকের স্থান এখানে নেই। তাঁরা জীবনের সত্যকে, হৃদয়ের সত্যকে কত দূরে সরিয়ে

রাখেন, সত্যের ও ন্যায়ের মানুষও অনেক দিক দিয়েই তাঁদের কপট ভান বেশ ভালভাবে জানতে থাকেন, এবং তাঁদের অন্তরের স্বরূপটিকে ভালভাবে চিনে নেন। চালিয়াতির চালাকির বা কপটতার স্থান "স্টেপ অ্যাসাইডে" নয়—বহু দূরে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের "স্টেপ অ্যাসাইডে" অন্তরের ও বাহিরের প্রবেশাধিকার পেয়ে দার্জিলিঙের কয়েকটি বিশিষ্ট বাঙালীর ভিলা ও কুটীর চোখে পড়ল। ডাক্তার ইউ. এন. ব্রহ্মচারীর "হোয়াইট হাউস" (White House), মিঃ এ. সী. সেনের "এলগিন ভিলা," হরিশঙ্কর পালের "বটকৃষ্ণধাম" এবং এইচ. এল. খাস্তগীরের "হিলক্রেস্ট" বাঙালীর বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করছে। এইগুলির মধ্যে সত্যিকারের বাঙালী জীবনের প্রবাহ এখনও চলেছে। সন্ধ্যা শেষের প্রায় দেড় ঘণ্টা পূর্বে বোটানিক্যাল গার্ডেনে উদ্ভিদ-জগতের নূতন পরিচয় লাভ ক'রে স্যানাটোরিয়ামের দিকে রওনা হলাম। এত কঠিন পাথরের বুক থেকে কোমল উদ্ভিদগুলো তাদের খাদ্যরস টেনে কেমন সহজ সুন্দর ভাবে আলোর পথে মুখ ক'রে চেয়ে আছে, তা ভাববার বিষয়ই বটে। এখানে আলো-জল-মাটি সহজে মেলে না, অথচ বোটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্ভিদ-সম্পদ এই তিনটিকে জোর ক'রে আদায় ক'রে প্রকৃত শক্তির পরিচয়-মাহাত্ম্য প্রচার ক'রে যাচ্ছে। এখানে এসে অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান অতি সহজে হয়ে গেল। সুখ-সুখ ক'রে আমরা যে চীৎকার করি, সে সুখ প্রতিদিনের নিয়মে বদ্ধ, কাজেই তার স্থায়িত্ব বা দায়িত্ব নেই ; আর যে আনন্দ সূর্যোদয়ের বা সূর্যাস্তের লাবণ্যরাশি থেকে হৃদয়ের ও মনের সত্যকে গ্রহণ করে, তা কখনও ভীত সঙ্কুচিত বা সন্ত্রস্ত থাকে না। সুখের মধ্যে রয়েছে রিক্ততা বা দারিদ্র্য, আনন্দের সঙ্গে রয়েছে

দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য। আনন্দ সংহারের মধ্যে, বন্ধনের মধ্যেও উদার ভাব প্রকাশ করে, বন্ধন ছিন্ন ক'রে দুঃখের শৌর্যবীর্যকে বরণ করে। আজকে এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে সুখের ও আনন্দের তুলনা দেখে বিধাতার চরণে আত্মনিবেদন করলাম। সুখের সমস্ত সামগ্রী শুধু ভালকেই চেয়েছে এবং পেয়েছে। আর আনন্দের সমস্ত সামগ্রী দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কঠিন পাথরের বুক থেকে অসীম দুঃখের ও ধৈর্যের ভিতর দিয়ে পথের ও মতের তুচ্ছ ধুলোকে ভূষণ ক'রে নিয়েছে, ভাল-মন্দকে, নিন্দাস্তুতিকে সমভাবে আত্মীয় ক'রে গ্রহণ করেছে—তার মধ্যে রয়েছে কত বর্ণের মিল, নীলিমার মিল এবং কত দিল অনাবিল! ভেবে দেখলাম—

"আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারি আকাশ
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ—
... ...
অকূলের এই বর্ণ এ যে দিশাহারার নীল—
অন্য পারের বনের সাথে মিল
আজকে আমার সকল দেহে
বইছে দূরের হাওয়া
সবার পানে চাওয়া।"

প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় স্যানাটোরিয়ামে ফিরে এসে ডায়েরির পাতাগুলি ভর্তি ক'রে নিলাম। একদিন হয়তো সেগুলো বড় হয়ে দেখা দেবে—যাদের হিসাব নেই তারাই বেঁচে থাকে আর যাঁদের হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় করা হয় তাঁরাই শেষে বেহিসাবী হন এবং নিজেরা বিপন্ন হয়ে বিপদও ঘটান বেশি। খাওয়ার পর বারান্দায় পায়চারি করছি, এমন সময় হঠাৎ কোন এক ব্যথিত শিশুর চাপা-কান্নার

শব্দ কানে গেল। দরজার কাছে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। অথচ কেমন যেন একটা করুণ ব্যাপার হচ্ছে! বিদেশে আমরা সবাই স্বজন—এই মনে ক'রে ভিতরে যেতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কর্তা ঘরে নেই, তিন বছরের শিশুটি খাট থেকে প'ড়ে গিয়ে একেবারে নীল হয়ে গেছে, আর মা ও মেয়ে কান্নাকাটি করছে। মা ও মেয়েকে সরিয়ে দিয়ে 'আর্টিফিশ্যাল রেসপিরেশন' দিতে আরম্ভ করলাম, খাটের উপরে রেখে ছেলেটির হাত-পা ঠিক ক'রে মাথায় ও চোখে জল দিতে শুরু করলাম। প্রথমে নাড়ী পাই নি, এবার নাড়ী পাওয়ার পর ম্যানেজারকে দিয়ে ফোন করিয়ে ডাক্তারের বন্দোবস্ত করলাম।

বাড়ির কর্তা ফিরে এসে দেখলেন, শিশুর শিয়রের দিকে ডাক্তারবাবু, অন্য দিকে মা ও মেয়ে আর এক দিকে আমি। ডাক্তারবাবু প্রাথমিক চিকিৎসার গুণগান ক'রে আশীর্বাদ জানালেন, সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বাবা-মাও নীরবে ধন্যবাদ দিলেন, আমি মাথা পেতে অসঙ্কোচে সকলের হৃদয়ের আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে ধন্য হলাম। হৃদয় উর্বর হয়ে ফলফুলে শোভিত হয়ে উঠুক। এ পৃথিবীতে যিনি মাথা উঁচু ক'রে স্নেহের আশীর্বাদকে উপেক্ষা করেন, তাঁর মরুময় উন্নত মস্তক মধ্যাহ্ন-তেজের শূন্যতায় শুষ্কতায় ও শ্রীহীনতায় দগ্ধ হতে থাকে। যাঁর মজ্জার মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে, যিনি মহত্ত্বকে বিশ্বাসের ঘরে বেঁধে রাখেন, তাঁর সংকল্প কার্য হয়ে ওঠে, কার্য সিদ্ধিতে পরিণত হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল আমরা দৈনন্দিন জীবনে যতই মহত্ত্ব উপার্জন করতে থাকব, হৃদয়ের বল যতই বাড়বে, দৃঢ়তা উদ্যম বিশ্বাস যতই বাড়বে, ততই আমাদের দেশের বীরগণ পুনর্জীবন লাভ করবেন। পিতামহ ভীষ্ম বেঁচে উঠবেন, দাতা-কর্ণ "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্" মন্ত্র নিয়ে পৌরুষকে মূর্ত করবেন, ভক্তবীর লক্ষ্মণ ও হনুমান আদেশপালন ও কর্তব্য

পালনকে ঘরে ঘরে জীবন্ত ক'রে তুলবেন। ছায়াবাজির উজ্জ্বল ছায়াকে স্থায়ী উন্নতি বলা চলে না। উন্নতির চাকচিক্য লাভ করেছি; কিন্তু উন্নতিকে ধারণ করবার, পোষণ করবার, রক্ষা করবার বিপুল বল তো লাভ করি নি। সেই তিনজন যুবক দার্জিলিঙের নির্জন ঘরে যে দুর্বলতার, অসম্পূর্ণতার, ক্ষুদ্রতার, অসত্যের, অভিমানের ও অবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, তাতে আমাদের চপলতা, লঘুতা, আলস্য, বিলাসই বেড়েছে মনে করব।

দার্জিলিং ভ্রমণের চতুর্থ দিন আমার শেষ পায়ে চলার ও চোখে দেখার দিন। পঞ্চম দিনে দার্জিলিং ছেড়ে যেতে হবে—সে দিন শুধু অন্তরের 'স্টক টেকিং'। সকাল নয়টায় নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে মেঘের রাজ্য ছাড়তে হবে। একটা কথা আছে, অন্ধ চক্ষুর উপরে সহস্র সূর্যকিরণ পড়লেও কোন ফল হয় না। আমাদের চক্ষের স্নায়ু সূর্যকিরণকে আমাদের উপযোগী আলো আকারে হৃদয়ের স্নায়ু দিয়ে গ'ড়ে নিতে হবে, তবে তো দেখার মধ্যে দেখতে পাব, শোনার মধ্যে শুনতে পাব, জানার মধ্যে জানতে পাব। তাড়াতাড়ি যাঁরা চলতে পারেন, লিখতে পড়তে পারেন এবং কাজ করতে পারেন, তাঁদের অন্যের তুলনায় সুবিধে হয় অনেক বেশি। এখানে কচ্ছপের আর জিত হয় না, খরগোশ সব সময়ই জেতে। যেখানে সময় ও স্থান সীমাবদ্ধ, কাজের ভারও অনেক বেশি, সেখানে তো কচ্ছপের মত চলাই জীবনকে অচল করা। সাত দিনে যে সব পরীক্ষকের প্রত্যেককে চার শো কাগজ দেখে দিতে হবে, সেখানে গজগতিতে বা কচ্ছপ-গতিতে চলতে হ'লে সব দিকেই বাধার সৃষ্টি হবে। এখানে দেখবার জন্যে এসেছি, সময় মাত্র একটি দিন—তাও শেষ দিন। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ! পদযুগল ও হস্তযুগলকে তিনি চলন্ত

রেখেছেন। আজকের দিনে আর নির্দিষ্ট নিয়মের তালিকা তৈরি করি নি।

'দার্জিলিঙে গিয়ে অবজার্ভেটারী হিল না দেখলে সব দেখাই একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায়'। কথাটার দাম নিশ্চয়ই থাকবে মনে ক'রে বরাবর চ'লে গেলাম সেই দিকে। সেখানে গিয়েই বৃহৎ পাহাড়ের বিচিত্র জগৎ সামনে ধরা দিল—পাথরে নয়, অক্ষরে ও অঙ্কে। ওই জায়গায় গিয়ে 'হিমালয়' এবং 'পামীর' যে ভগবানের কিরূপ বিরাট সৃষ্টি তার একটা স্পষ্ট ধারণা হ'ল। অবজার্ভেটারী হিলে সাধারণ লোক গিয়ে কোন আনন্দ পাবে না, কোন রসও উপভোগ করতে পারবে না, কারণ রসময়ের রূপলাবণ্য সেখানে কয়েকটি অঙ্কের রেখায় এবং পাহাড়ের হিসাবে লিপিবদ্ধ। সেখানে ফুটবল খেলার মাঠের আকর্ষণ নেই, সেখানে ছবিঘরের বা আধুনিক গানের ছড়াছড়ি নেই ; যেখানে মুড়িমুড়কির এক দর নেই, যেখানে বাইরের বা ভিতরের ফাঁপা ভাব নেই, সেখানে পাহাড়-পর্বতের বিরাট ও গভীর পরিচয় পেলাম। সেখানে গিয়ে কয়েকটি লেখার ও রেখার দাম বিশেষ ভাবে জেনে নিয়েছি। জীবন্ত বাঘ-সিংহের পরিচয় যেমন গভীর জঙ্গলের ভেতরে নেওয়াটা খুবই বিপজ্জনক, পাহাড় পর্বত সম্বন্ধেও সেই একই কথা। সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে সমস্ত পাহাড়-পর্বতের দৈহিক পরিচয় করা জীবন বিপন্ন করা। নিকটের দুই-একটির মধ্যেই আত্মদর্শন করা সমগ্রকে দর্শন করা, খাঁটি সোনার অলংকার তৈরি করতে গিয়ে সমস্ত সোনাকেই নিকষে ঘষতে হয় না, একটা দিক ঘষলেই সমস্ত সোনার যাচাই করা যায়। একটা বৃহৎ সত্যের ক্ষুদ্র অংশের সত্যিকার পরিচয়ই সমগ্র সত্যের পরিচয়। আজ এই নির্জন পাথরের দেশে হৃদয়ের আবেগেও কোন সীমা পাওয়া যায় না, সীমাবদ্ধ চিত্রের ও

অঙ্কের রেখার ভাবের গণ্ডীতে প্রকাশিত রয়েছে সমস্ত পাহাড়ের দেশের রূপ-বৈচিত্র্য। এখানে ভাষার সিঁড়ি নেই, ভাবের কায়দা নেই; কিন্তু বেড়া আছে, আর অসীমের প্রকাশ চিহ্নিত রয়েছে ভাষাহীন সংকেত-চিহ্নে। ভোগের সমঝদার থেকে, প্রমত্ত পৌরুষের পুরুষানুক্রমিক লাঞ্ছনার ভারে নিষ্পিষ্ট থেকে প্রকৃতির প্রাচুর্যকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা থাকে না দেশে-বিদেশে, অন্তরে-বাহিরে; অন্তরের পরিচয় ঘটে আত্মদর্শনে,—অভিমানে বা অহংকারে নয়।

দার্জিলিঙের বোটানিক্যাল গার্ডেনে, জাদুঘরে, চিড়িয়াখানায় বা লেকে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে এমন দেখা মেলে নি, এমন পাওনা পাই নি, এমন জানবার পথ জোটে নি। পাথরের পাতাতে, জলে আলোতে যতটুকু মেলে, সামান্য চিত্ররেখার দাগে তার চেয়েও বেশি মেলে, যদি চোখ বা হাত খোলা থাকে।

নোট-খাতায় নকল ক'রে নিলাম ঐ পর্বতের সমস্ত রেখার বিবরণ। সামান্য সামান্য রেখায় কত পাহাড়ের কত দেশের বিবরণ পাওয়া গেছে।

প্যানোর‍্যামিক প্রফাইল অব্ দা হিল রেঞ্জেস্ অব্ সিকিম :—

		উচ্চতা	দূরত্ব (দার্জিলিং থেকে)
১।	টংলো	১০০৭৪ ফুট	১১ মাইল
২।	সেন চুকফু	১১৯২৯ "	১৭ "
৩।	সবুরকুম	১১৬৩৬ "	১৭ "
৪।	ফালুট	১১৮১১ "	১৯ "
৫।	সিংলিলা	১২১২৬ "	২০ "
৬।	লামফেরাম	১২৮২৭ "	২৩ "

		উচ্চতা	দূরত্ব (দার্জিলিং থেকে)
৭।	ডাংগোলা	১২৮২৭ ফুট	২৩ মাইল
৮।	কাংগোলা	১২৮২৭ "	২৩ "
৯।	নেপালের জান্নু	২৫৩০৪ "	৪৬ "
১০।	কাবুর অথবা কাব্রু	২৪০১৫ "	৪০ "
১১।	কাঞ্চনজঙ্ঘা	২৮১৫৬ "	৪৫ "
১২।	পানডিন	২২০১৭ "	৩৬ "
১৩।	নার্সিং	১৮১৪৫ "	৩২ "
১৪।	ডী জেড্	২২৫২০ "	৪৬ "
১৫।	চোমি উমো	২২৩০০ "	৭০ "
১৬।	ডী জেড্ (ট্যাকচাম)	১৯২০০ "	৪৯ "
১৭।	দাবদি জী		
১৮।	পেয়ায়াংস্তে জী	৬৯২২ "	১৮ "
১৯।	টাসিদিং জী		১৯ "
২০।	র‍্যালিং জী		১৯ "
২১।	নবলিং জী		৪৯ "
২২।	রিচিং পাং	৬১৯২ "	৫১ "
২৩।	পান্ছিম রি		৫২ "
২৪।	চাংগা চেলিং জী	১৯২০০ "	৪৯ "
২৫।	লিচি জী		৯ "
২৬।	কিরসং	১২২৫৮ "	২৮ "
২৭।	কাঞ্চনজঙ্ঘা	২২৫৬৯ "	৬৯ "
২৮।	দাওকিআ রি	২৩১৩৬ "	৭২ "
২৯।	সিংকাম		

		উচ্চতা	দূরত্ব (দার্জিলিং থেকে)
৩০।	দোপেন দিকাং	১৭৩২৫ ফুট	৪৩ মাইল
৩১।	লিংটার	১২৬১২ "	৩৬ "
৩২।	ইয়ামপাং	"	"
৩৩।	নারিমা	২৩১৩৬ "	৭২ "
৩৪।	গিপমোচি	১৪৫১৮ "	৪২ "
৩৫।	ভূটানের শিখর	"	"
৩৬।	রিচিলা	১০৫০০ "	৩০ "
৩৭।	টাবলা (ভুটান)	"	৪৫ "
৩৮।	তাগুডা	১৩৩৪৮ "	৮৫ "
৩৯।	মেনং জী	১০৬৩৭ "	২১ "
৪০।	মেনং জী রক	"	"
৪১।	রাফুলা	"	১৪ "
৪২।	নান্‌তসে জী		১১ "
৪৩।	টেনডং	৮৬৭৬ "	১৪ "
৪৪।	চেদাম	"	"
৪৫।	চুমসেরিং	৬৯৪৫ "	২১ "
৪৬।	সীলামদিবা ইচা		১৭ "
৪৭।	দিওলো	৫৫৯০ "	১৫ "
৪৮।	কালিম্পং	৩৯৩০ "	১৩ "
৪৯।	সং চংলো	৬২৬৬ "	১৮ "
৫০।	সেনচো হিল	৮৬০০ "	৪-৫ "
৫১।	টাইগার হিল	৮৫১৪ "	৪-৫ "

এক জায়গায় ব'সে লিখছি আর ভাবছি, ওদের সঙ্গে আর কি

দেখা হবে? আমার চারদিনের মেয়াদ কি আজকেই ফুরোবে? ইচ্ছা থাকলেই তো সব হয় না। আমাদের দেখার মধ্যে থাকে সময়ের নির্দেশ, অর্থের পরিমিত ওজন। একবারেই যথাসাধ্য শেষ ক'রে যেতে হয়, বাকি যা থাকে তার শোধ আর হয় না। এই সীমাতে এসেই অসীম সম্বন্ধে আর সন্দেহ জাগে না, তাঁর বিরাট ভয়ঙ্কর সুন্দর সম্বন্ধে আর জিজ্ঞাসা থাকে না। দেখলে কেবল দেখতেই ইচ্ছা হয়, পেলে শুধু পেতেই ইচ্ছা হয়, জেনে জেনে মনে হয় অজানার পথ কত দূরে, তাঁর আহ্বান কেন আসে ফিরে—যাবার উপরে তখনই মনে হয়, "তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ্, শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।"

ছায়াময় পথ। শান্তিময় প্রকৃতির ঘর। কোথাও কোলাহল বা কলরব নেই। আলো-ছায়া মেঘ-কুয়াসা একসঙ্গে সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, মুখের উপর, গায়ের উপর, হাতের উপর এসে ওরা খেলা করে। মাঠের ফুল, মেঘের রঙ, ভোরের বাতাস এখানে নেই; কিন্তু সন্ধ্যার প্রশান্ত সুন্দর আলো আশীর্বাদ দিয়ে যায়। স্নেহভরে ব'লে যায়, তোমার যাত্রা শুভ হোক, তোমার অভিযান জয়যুক্ত হোক, নিখিল 'অস্তরাগের জ্যোতির্ময় রথ' বিশ্বেশ্বরের জয়ধ্বনি বহন করুক। রঙের আলো, মেঘের পরশ, অনন্তের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে পাথেয়হীনকে পথ দেখাচ্ছে। যে পথ চায় সেই পথ পায়। পথ তো নিজে এসে ধরা দেয় না। পৃথিবীতে হিটলার যে পথ চিনে এগিয়ে গিয়েছেন, সে পথ তাঁকে সরিয়ে রেখেছে অনেক দূরে; যে পথে চার্চিল হুঙ্কার করেছেন, সে পথে হাহাকারই বেড়েছে, অহঙ্কারই বেড়েছে। পথের কোন সীমায় তাঁরা পৌছান নি, কিন্তু এই সব নির্জন পবিত্র সত্যের পথ ধ'রে যাঁরা চলেছেন, তাঁরা সীমায় পৌছেছেন, সিদ্ধিও লাভ

করেছেন, সাধনার পথও রচনা ক'রে গিয়েছেন। এই বিজন পথে সুজনের পথ পেয়ে যীশুখ্রীষ্ট একদিন ক্রুশবিদ্ধ হয়েও ক্রোধবিদ্ধ হন নি, বিশ্বকে ক্রোধমুক্ত করেছেন। এই বিজন পথের সন্ধান পেয়ে বুদ্ধদেব হিংসাবদ্ধ বিশ্বকে অহিংসায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই বিজন পথের মুক্তির সন্ধান পেয়ে মরুমরীচিকামুক্ত ধর্মপ্রাণ হজরত "আল্লা এক অদ্বিতীয়, একমেবাদ্বিতীয়ম্"-এর অমৃতস্বাদ পেয়েছিলেন। সত্যের ও সাম্যের সাধক পরমহংস, বিদ্রোহ-বিপ্লবের বীর্য-সংস্থাপক বিবেকানন্দ অসীম সমাধির অন্তরে মানব-জাতির 'যত মত তত পথে'র একনিষ্ঠ ঐক্যমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। আমি একা—সহায়হীন, চিরসঙ্গীহীন, এই বিরাটের গম্ভীর ধ্যানের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'ল—"ক্ব সূর্যপ্রভবোবংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়ামতিঃ!" কে দেখাবে অমৃতের পথ? কে দেখাবে সবার ঐক্যের পথ? কোথায় সে দ্বারী?

আছে—পথ আছে। এত উপরে নয়। 'আরও নীচে নেমে এস নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ'—এ সত্যটি কে যেন অন্তরে-বাহিরে লিখে গেলেন। পথ পাওয়ার ও পথে চলার বিপুল আনন্দে নেমে এসে পেলাম সেই চিরবাঞ্ছিত মুক্তি-কুটীর। নাম স্টেপ অ্যাসাইড। "স'রে দাঁড়াও, যাদের সাহস নেই, যাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি নেই, আর্তকে পীড়িতকে বাঁচাবার প্রাণ নেই।" দূর হতে কেবলই শুনি, 'আর কত দূর?' সবই কি তবে স্বপ্ন? সবই কি অলীক? পৃথিবীতে কি মনের মানুষ, হৃদয়ের মানুষ, ভাবের মানুষ নেই? কোথায় গেল সব অমৃতস্য পুত্রাঃ? কোথায় গেল তাদের বংশধরগণ? হায়, তাদেরও কি জাগরণ নেই? তাদেরও কি আস্থা নেই? যীশুই বা কোথায়? পরমহংসই বা কোথায়? তাঁদের চোখের জলে তো পাথর গলে নি। তবে মানুষের এত শোচনীয় পরিণাম কেন?

হে অচল বন্ধো! তোমার সঙ্গে সেদিন আমার গভীর পরিচয় হ'ল। তোমার নিমন্ত্রণ খেয়েছি মাত্র চার-পাঁচ দিন। ভাবের পরিচয় থাকে হৃদয়ে, বাহিরে তার অস্তিত্ব কদিনের জন্যে! পরিচয়ের অনেক কারণ রয়েছে, প্রীতির অনেক বন্ধন বেড়েছে, হৃদয়ের গভীর সান্নিধ্য মিলেছে—তাই তো তোমাকে চিনেছি এবং পেয়েছি। তোমার মধ্যে যে সম্পদ রয়েছে, মানুষের মধ্যে তার কিই বা আছে! হাজার হাজার বছর কেটে গেল, তুমি রইলে খাঁটি আর মানুষ হয়ে গেল একেবারে মেকী! তোমার মধ্যে বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বা দ্বিতীয় পর্ব নেই, বর্বরতার বা পশুত্বের স্থান নেই, তোমার ধ্বংসেরও রূপ আছে, ধ্যান আছে, গাম্ভীর্য আছে, শান্তি সমাধি আছে। তোমার ধ্বংসে বিশ্বের সৃষ্টি হয়, মানবজাতির কল্যাণ হয়, সব দিকে আশীর্বাদের ধারা ব'য়ে যায়। তোমার মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থাকে, কিন্তু মানুষের জঘন্য ঘৃণা বা বর্বরতা থাকে না। যতই ভুলে যাই, ততই মনে হয় তুমি কত যে অন্তরের অন্তরতম বন্ধু। "সৌন্দর্যের তুমি চিরকালের আনন্দস্বরূপ"—সে শক্তি কোথায়! সে সাধনা কোথায়! সে শান্তি কোথায়! সভ্যতার তো এত বাহার! তার মধ্যে কিই বা আছে? শিক্ষার তো এত আয়োজন! প্রয়োজনের মধ্যে তার দান কতটুকু? মানুষ কি যে চায়, তাই সে জানে না। সভ্যতা যে কার নির্দেশ মেনে চলবে, তার কোন নির্দিষ্ট আদেশ নেই? স্বাধীনতার স্থান কোথায়? তাকে পেয়েছে কয় জন? চিনেছে কয় জন? ফুলের মত কোমল যে শিশুপ্রাণ ভগবানের অপূর্ব উপহার ব'লে সভ্যতা মেনে নিয়েছে, তাকেও মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে আছাড় দিয়ে যে সভ্যতার ছাড়পত্র লিখিত হয়, তার স্বাধীনতার কোন্ দাম আছে? স্বামীর চোখের সামনে স্ত্রীর উপর জঘন্য অত্যাচার ক'রে, মেয়ের উপর জঘন্য

অত্যাচার ক'রে যে স্বাধীনতা গর্ব করে এবং তাকে সমর্থন করবার জন্যে যে সব স্বাধীন জাতি আনন্দের অট্টহাসি নিয়ে তাকে ফলাও করে, সেই জাতির ধর্মনীতির ব্যাখ্যা করবার অধিকার কোথায় আছে? শুধু তাই নয়, সঙ্ঘবদ্ধভাবে মিছিল ক'রে নায়কগণ অত্যাচারের পর স্বামীর প্রাণটিকে কবুতরের মত ছিঁড়ে ফেলে সাম্য, মৈত্রী ও প্রেমের বাণী বেতারযোগে ছড়িয়ে দেয়। পৃথিবীটা এখনও দু ভাগ হয়ে যায় নি, সভ্যতা এখনও মানব-সমাজ থেকে অন্তর্হিত হয় নি, স্বাধীন জাতিগুলি আবার বীরত্বের গর্ব করে! যে সভ্যতা বা স্বাধীনতা শিশুভগবানকে এবং মাতৃজাতিকে রক্ষা করতে জানে না, সম্মান দিতে জানে না, রাষ্ট্রের তাণ্ডবলীলায় মেতে তাদের ওপর তাণ্ডবলীলা ঘটায়, সেই জাতি বসুন্ধরার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, সেই জাতির পৃষ্ঠপোষকগণ ও ধারকগণ লুপ্ত হয়ে যাক। পৃথিবী সভ্যতাহীন, সমাজহীন, অশিক্ষিত জীব নিয়ে অন্ধের মত চলুক। এর পর যে শাস্তি হবে, সে শাস্তি ভয়ঙ্কর সুন্দর সত্যে নির্মম নিষ্ঠুর। এ পেতেই হবে, দিতেই হবে, পাপকে তাজা রেখে যে পাপীর মিতালি হয় তাতে পাপীর মুক্তি হয় না, প্রায়শ্চিত্তও হয় না, হয় সবার ধ্বংস। হয় সত্যের ও ধর্মের দুর্গতি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্টেপ্ অ্যাসাইড (Step-Aside) সে সত্য কালের কঠোর অক্ষরে লিখে রেখেছে। মুছে গিয়েছে বৈষ্ণব-কবির প্রেমপবিত্র ত্যাগের দেহ, ক্ষয়ের মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছে স্বদেশত্যাগের অগ্নিমন্ত্র আর স'রে পড়েছে বহুদূরে পতিতের বন্ধুর ভগ্ন মৌন দেহ। কিন্তু সবার উপরে রয়েছে মানুষ চিত্তরঞ্জন, ত্যাগের ও যোগের চিত্তরঞ্জন এবং অমৃতের সেবক চিত্তরঞ্জন। সেই স্টেপ-অ্যাসাইড (Step-Aside) গৃহ, মন্দির আজ চূড়াহীন, চৌর্যদীন, অন্তঃসার-

রিহীন। হীন পতিতের ভগবান আর কোথাও নেই। সভ্যতার বহু পূর্বেও যেমন চাপা ছিল, বহু পরেও ঠিক তেমনই চাপা রয়েছে। তাদের উদ্ধার করবার জন্যে অনেকেই দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু সেই দাঁড়াবার পথে অবলম্বন মোটেই নেই। অবলম্বনহীন জাতি স্বাবলম্বী হতে পারে না, দেহেতে মৃত্যু, মনেতে মৃত্যু এবং শক্তিতে পক্ষাঘাত হবেই।

বিদায়ের দিনে মনে হ'ল, "হে বন্ধু, কি চাও তুমি দিবসের শেষে, কি মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার ?"

বিদায়ের দিনে দার্জিলিঙের বাহির-ভিতর প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করলাম। এর শান্তি তো শান্তি নয়, এর মঙ্গল তো মঙ্গল নয়। এর ভেতরের মানুষ এক, বাহিরের মানুষ আর এক, এর হৃদয়জগতে চলে এক কাহিনী এবং দেহের জগতে চলে বিচিত্র কাহিনী। একে তৈরি করেছে মানুষ তার স্বার্থ আদার করবার জন্যে, তার ভোগ সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করবার জন্যে—কে বাঁচে বা কে মরে তার দিকে নজর নেই। উদারতার স্থান নেই, অহমিকার উত্তেজনা আছে; উন্মুক্ত আলোর আনন্দ নেই, উলঙ্গ আকাশের মরীচিকা-নৃত্যের সুখ আছে; জ্ঞানের গভীরতা নেই, জ্ঞানীর বিকৃত বিদ্রূপ আছে। এ রাজ্যে যাদের প্রাচুর্য আছে তাদের মুখভরা হাসি ফুটে থাকে, কিন্তু বুকভাঙা বিদীর্ণ শোকের গহ্বর ফেটে মৌন রয়। দার্জিলিঙে এসে যখন পথচারী পথিক প্রকৃতির অন্তরে আপনার অন্তর মিলিয়ে নেয়, তখন সে জানে 'বাণীর সঙ্গে বাণী, গানের সঙ্গে গান, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ'। তখন 'বিস্ময়ের নব জাগরণ তরঙ্গিত হয়' আকাশে বাতাসে। তখন মনে হয়, কোনখানে অভাব কিছু নেই। পাথর পরাণ হিরণ্ময় ক'রে প্রেমের পরশমণি চিনে নেয়। সব জানার মাঝে হয়ে যাই অজানার যাত্রী। সকল বন্ধন নিমেষে নিমেষে টুটে যায়।

"অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই তো মুক্তি,
তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি,
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়
প্রেমিক সে নির্দয়।"

বাইরে সম্বল রয়েছে, ভেতর একেবারে অবলম্বনহীন। ভেতরে শুধু অন্তঃসারশূন্য তর্জন গর্জন। আমি দেখলাম—'খোলা তব বিচারের ঘর।' আমি সেই বিচারের শেষ রায়টি সঙ্গে ক'রে ফিরে এলাম। দূরে হতে শুনি মৃত্যুর গর্জন। মানুষ দীন ভিক্ষুকের মত স্বার্থমগ্ন উদাসীন। এই উতরোল হাসির অন্তরে ক্রন্দনের কলরোল। এই রাজ্যে মায়ামমতার গ্রন্থি নেই, ভ্রান্তি আছে; ভক্তির হিল্লোল নেই, মুক্তিরঙ্কের কল্লোল আছে। এদের স্বাধীনতা রয়েছে সত্যকে ভেঙে, ধর্মকে রঙিয়ে, নীতিকে ঠেঙিয়ে আপনাকে বাঁচাবার জন্যে। এদের বিশ্বাস করা যায় না, নির্ভরও করা যায় না—এরা শক্তিকে অধিকার করে ক্ষমতা জাহির করবার জন্যে। এদের মা নেই, মেয়ে নেই, পত্নী নেই, প্রীতি নেই। এরা ঘরের মাকে বাইরে রেখে পত্নীকে ভিতরে রাখে—যেই পত্নী মা হয়ে ঘরের মাকে পূজা করতে চায়, তখন ওরা সবই হারায়। এখানে সবই আছে অথচ কিছুই নেই, এখানে সবই আসে আর যায়, আর মেকী।কনে মিথ্যাকে বদল ক'রে যায়। এ দেশ দেশ নয়, এ দেশে মানুষে মানুষে পরিচয় হয় না—মানুষকে মেরে যারা আতঙ্ক আনে, উন্মত্ত ক্ষমতা দেখিয়ে যারা শখের বাগান তৈরি করে, এখানে তাদেরই আদর, এখানে তাদের সমাজ, এখানে শহীদের বা দধীচির স্থান নেই—ডালমিয়া-বিড়লার প্রতিষ্ঠা রয়েছে! কর্ণে প্রতিধ্বনি হ'ল—

"বাহ্নবন্যা তরঙ্গের বেগ,

ভূতল-গগন—

মূর্ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন।"

এখানে জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ নেই, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের ভাবলেশ নেই,—এখানে সত্যের সঙ্গে শক্তির পরিচয় নেই। মৃত্যু তো সহজে আসে না, আহ্বানের পরও সে দূরে থাকে। সময় যখন হয়, সমস্ত দিক যখন প্রস্তুত হয়, তখনই সে তার অভিযান শুরু করে, ডাকিনী নাগিনীদের সঙ্গে নিয়ে। দার্জিলিঙের পাহাড়ের প্রত্যেকটি প্রস্তরে পূর্বপুরুষের দীর্ঘশ্বাসভরা, আপন ভাই-বোনেদের দাসত্ব-বেদনার অস্থিপিঞ্জর লুকায়িত রয়েছে। দার্জিলিং সৃষ্টি প্রয়োজনের তাগিদে, সেবার জন্যে নয়, সাধনার জন্যে। সেই প্রস্তরের অন্তরে ক্ষুধিত পিপাসার তৃপ্তিনৈরাশ্য এবং অতৃপ্ত দাহিকা-বহ্নি স্বাধীন ভারতের কবর রচনা করছে। এখানে শিব বিশ্বের বিভূতি নিয়ে নগ্নতাকে বরণ করে না, বরং দহন করে; মঙ্গল শক্তিকে পূজা করে না, মাঙ্গলিক কুসংস্কারকে আরাধ্য বস্তু ব'লে গ্রহণ করে। দার্জিলিং আলোক-সজ্জা বিলাসব্যসন-সজ্জারই আর এক করুণাময় রূপ। এর গাছলতা মাটিপাথর বৈদেশিক বজ্জাতির অন্ধ অনুকরণে স্বজাতিবিদ্রোহী, কিন্তু পরপদলেহী। যে স্বাধীনতা দার্জিলিঙের অন্তরে বাহিরে মূর্ত রয়েছে, সে স্বাধীনতা অর্থগৃধ্নু লোভীদের মারাত্মক অস্ত্রবিশেষ। দুর্বলকে দরিদ্রকে মারবার জন্যে তার ব্যবহার; ধনীকে ধনমদের গর্বে উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল করবার জন্যে তার সংরক্ষণ। শুধু কয়েকটি রাজনীতির ছন্নছাড়া বুলিতেই ভিটাছাড়া বন্ধুহারা এবং পরিবারহারা লোকদের মনে শান্তি আসে না, শক্তি বাড়ে না, এবং স্থায়ী একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

দার্জিলিঙের মরণে মরণে আলিঙ্গনের মধ্যে রয়েছে নূতন জাতির

নূতন সমুদ্রতীর। এখানে সংগ্রামজয়ী কাণ্ডারীর আদেশ শিরোধার্য, কিন্তু পক্ষপাতিত্বপূর্ণ অন্যায়কারী কাণ্ডারীর আদেশ উপেক্ষণীয়। পাহাড়ের ওঠানামার নিয়ম আছে—যথেচ্ছচারিতার শাস্তি অনিবার্য। পাহাড়ের শীর্ষদেশে ওঠবার রাস্তা তো অনেক থাকে না—থাকে মাত্র কয়েকটি। নূতন পথ তৈরি না করা পর্যন্ত পুরনো পথকে ধ'রে উপরে যেতে হয়। গায়ের জোরে শক্তি জাহির করা চলে না। পাথরগুলি যেখানে অগ্নিকুণ্ডে গ'লে গ'লে চারদিকে আগুন ছড়াচ্ছে, সেখানে প্রতিকারহীন বেশে প্রবেশ করতে দেওয়া ধ্বংসকে বরণ করা, আগুনের মুখগহ্বরকে আরও বিস্তৃত করা। যেখানে বিলাসে মৃত্যু, ভোগে বিষ, অনুরাগে ছলনা, প্রেমে বঞ্চনা, আর বীরত্বে বিদ্রূপ, সেখানে মৃত্যুর বিভীষিকাই রাজত্ব করে, দুর্ভিক্ষের করালমূর্তিই শান্তির রাজ্যকে দীনভিখারীর দুর্বল রাজ্যে পরিণত করে। সেই উগ্র স্বাধীনতা বীর্যবানকে কাপুরুষ করে, শহীদকে শয়তানের গোলাম ক'রে রাখে এবং সত্যের সেবককে লম্পটের তোষকে রূপান্তরিত করা হয়। সব দিকে দেখলাম—মৃত্যু, শুধু মৃত্যু।

'ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে' তরী নিয়ে পাড়ি দিতে হবে। এক দিকে পাহাড়ের পর পাহাড়ের বন্ধুর ভয়ঙ্কর কর্কশ মসৃণ লক্ষ লক্ষ জীবন-সিঁড়ি, অন্য দিকে অনন্ত জীবন-সমুদ্রের অপার অতল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ চঞ্চল জীবনের পরিণতি। স্বাধীনতার চরম সার্থকতা এই দুই শক্তির সামঞ্জস্যে এবং বিরোধের মীমাংসায়। অন্যায় অবিচার অত্যাচার পায়ের তলায় চেপে রেখে দার্জিলিং শুভ্র নির্মল বিচিত্র সুন্দর শীর্ষদেশ অধমকে আকৃষ্ট করবার জন্যে রেখেছে, অসংখ্য আশ্রয়হীন শ্রীহীন ভুখারীর স্থান দিয়েছে আর বিশ্বের স্নেহভরা ঝটিকা-মেয়ের আবদার অবহেলায় সহ্য করেছে। বিদায়ের সময় ডাক এল দূর থেকে—

"তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।"

ঘর ছেড়ে দাঁড়ী তো ছুটে আসে নি, আরাম ছেড়ে যাত্রা করবার জন্যে যাত্রীদল প্রস্তুত হয় নি, ঝড়ের গর্জন উপেক্ষা ক'রে বিদ্যুতের আলোকে পথ চিনে নেবার দুর্জয় সাহসী বীর মস্তক তুলে দাঁড়ায় নি।

"টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।"

তখন মনে হ'ল, এ দেশে স্বাধীনতা এলেও অধীনতার এবং কাপুরুষতার ফাঁস চার দিকে তৈরি করবে। দার্জিলিঙের একটি কোণেও উদারতার স্থান নেই। দুর্বলকে সবল করবার জন্যে স্বার্থ বলি দেবার মনোবৃত্তি কোথাও পেলাম না। আপন আপন গৃহে স্বার্থকে বড় ক'রে বৃহৎ স্বার্থকে ছোট ক'রে রাখা দার্জিলিঙের বৈশিষ্ট্য। স্নেহ ভালবাসা ব'লে কোন সাত্ত্বিক গুণ সেই রাজ্যে নেই। সাধনায় বা তপস্যায় দার্জিলিং তৈরি হয় নি, সেবায় বা শ্রদ্ধায় ওর জনসাধারণ গৃহ-মন্দিরের দেবতাকে চিনে নেয় নি, জাতীয় ইতিহাসের সত্যকে জীবন-সত্তায় সঞ্চারিত করে নি। চারিদিকে ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জীভূত, প্রবলের উদ্ধত অন্যায় স্বাধিকারপ্রাপ্ত, চিরবঞ্চিত সেখানে চিরলাঞ্ছিত এবং চিত্তক্ষুব্ধ মানব দেবতার অসম্মানে বিধাতার বক্ষ বিদীর্ণ—যত হিংসাহলাহল কুলমান উল্লঙ্ঘিয়া সর্বত্র তরঙ্গিত। আমার মত বন্ধুহীন অর্থহীন দরিদ্রের স্থান তো নেই-ই। দার্জিলিং আমাকে ভালবেসেছে তার সমস্ত প্রাপ্য আদায় করবার জন্যে, আমার

পবিত্র হৃদয়ের ভালবাসাকে অধিকার করেছে তার কপটতাকে লুকিয়ে বিরাট কারবার করবার জন্যে। আমাকে সামান্য উপহার দিয়ে আমার জীবনের সঞ্চিত সমস্ত পুণ্যবল কড়ায়-ক্রান্তিতে আদায় ক'রে নিয়েছে। হায় দার্জিলিং! মানুষকে ফাঁকি দিয়ে, সত্য-সুন্দরকে ছলনা ক'রে কত জীবন-দেবতাকে পথে বসিয়েছ! জীবনের অর্থসম্বলহীন অবস্থায় মানুষের সত্তাকে তুমি পিষে নষ্ট ক'রে দাও, দারিদ্র্যের মহত্ত্বকে মাহাত্ম্যকে তুমি কত করুণার পাত্র এবং উপেক্ষার আধার ক'রে চোরাবাজারের কারবারে অংশীদার ক'রে নাও, অন্তরের মহামূল্য প্রেম-ভালবাসাকে অর্থের বিকারে কত বিকৃত এবং বিধ্বস্ত ক'রে রাখ। তোমার এ রূপ, তোমার এ রীতি, তোমার এ আকর্ষণ মহৎকে ক্ষুদ্র করবার জন্য, উদারকে উদয়হীন করবার জন্য! দার্জিলিং! তুমি হৃদয়রত্নকে তোমার হৃদয়ে বসাতে পার না, সত্যের স্বর্ণ-সিংহাসনকে সাধনার ও বৈরাগ্যের ধনহীন শক্তির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পার না—তোমার আবার স্বাধীনতা কি? তোমার সৌন্দর্যই বা কি? তোমার তপস্যাই বা কোথায়? তুমি মুষ্টিমেয় লোভী বঞ্চকের ক্রীড়াশৈল ও পুষ্পময় কারাগার।

দার্জিলিং! যখন মনুষ্যত্বের সব ছিল কিন্তু ছিল না অর্থ, তখন তুমি দিলে বিদায়, করলে উপহাস, আনলে বিদ্রূপ, তিরস্কার, নির্যাতন, লাঞ্ছনা, আর যখন মনুষ্যত্বের সব বিক্রি ক'রে অমানুষের সব সম্বল অধিকার করেছি, তখন তুমি পাঠালে নব নব দূত, নব নব উপহার, নব নব অলঙ্কার—নিত্যনবীন পরিবর্তনশীল রূপ-রস-স্বাদ-গন্ধের পুষ্পমাল্য! যখন সোনার মানুষ হয়ে, সত্যের সেবক হয়ে, ন্যায়ের সাধক হয়ে, উদারতার গ্রাহক হয়ে তোমার সৌন্দর্যের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন তুমি ছিলে কোথায়? "বহুদূরে, কাঙাল নয়ন যেথা

হতে আসে ফিরে ফিরে।” আর এখন তুমি আমার দুয়ারে প্রতীক্ষায় থেকে থেকে আমার এত বড় ছলনার, এত বড় অহমিকার, এত বড় আত্মবঞ্চনার, এত বড় বিকারের সেবা কর, পূজা কর, শ্রদ্ধা কর! ধিক! ধিক তোমার ঐশ্বর্য! ধিক তোমার রূপলাবণ্য! ধিক তোমার নেতৃত্ব! পৃথিবীতে সবচেয়ে পাপী তুমি। তুমি লক্ষ লক্ষ নির্দোষ নিষ্পাপ জীবনকে লুব্ধ ক'রে ক্ষুব্ধ ক'রে অন্তঃসারবিহীন কাপুরুষ তৈরি করেছ, পথের ভিখারী তৈরি ক'রে চোর ডাকাত সাজিয়েছ, আবার বিচারদণ্ড ধ'রে সেই সব নিরীহ নির্দোষ জীবনকে পঙ্গু অচল বিকৃত ক'রে রেখেছ। তোমাদের অর্থহীন, নীতিহীন দণ্ডদাতার শাস্তিবিধান অপরিহার্য। চারিদিকের গভীর নৈরাশ্য হাহাকারের অন্তরে

“দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে ;
মৃত্যু করে লুকোচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি'।”

বিদায়ের শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে দার্জিলিং মেল অকম্পিত বুকে ছুটল। মৃত্যুর অন্তরে অমৃতের সন্ধান পেয়ে অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপকে প্রত্যক্ষ ক'রে ধন্য হলাম। মিথ্যা! তার আয়ু কত দিন? লোভ! তার রাজত্ব কত দিন? অহঙ্কার! তার অত্যাচার আর কতকাল? নির্ভীক চিত্তে নির্মম সত্য প্রত্যক্ষ হ'ল—

“তোরে নাহি করি ভয় ;
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিই, দেখ্‌
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।”